কোভিড ১৯ : মন-সমাজ-অর্থনীতি

কথোপকথনে

মোহিত রণদীপ
শুভেন্দু দাশগুপ্ত

ঠিকঠিকানা
কলকাতা

বইয়ের কথা

কোভিড-১৯ রোগটা ঘিরে আমাদের চিন্তা প্রথম ছিল শরীর নিয়ে, শরীরের অসুখ নিয়ে।

সে বিষয়ে আমরা বই বানিয়েছি ডাক্তার স্থবির দাশগুপ্তকে প্রশ্ন করে। প্রশ্নের উত্তরে তিনি যা বলেছিলেন তা নিয়ে বইটি পাঠকদের মনে সাড়া জাগিয়েছে। পরে পাঠকদের নিরন্তর প্রশ্নে লেখক তার লেখাকে বাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছেন, বইটির সংস্করণ বেড়েছে।

কোভিড-১৯ রোগটা ঘিরে আমাদের চিন্তা এখন শুধু শরীরের অসুখ নিয়ে নয়, মনের কষ্ট নিয়েও। রোগটিকে ঘিরে, রোগের জন্য সরকারি নির্দেশে ঘরবন্দি হয়ে থেকে, অর্থনৈতিক সংকটের সামনাসামনি হয়ে মনের কষ্ট হচ্ছে। কষ্ট বাড়ছে।

এই বিষয়টি নিয়ে কথা হয় আমার বন্ধু মোহিত রণদীপের সাথে। যার কাজ মনের কষ্ট সারিয়ে দেওয়া, এই কাজে মোহিত রয়েছে অনেকদিন। কাজটি মোহিত শুধুই ব্যক্তিগতভাবে করে চলেছে তা নয়, সাংগঠনিক ভাবেও।

মোহিতের সাথে আমার বন্ধুত্বও অনেকদিনের। সেই বন্ধুত্বের দায়বদ্ধতায়, সমাজের প্রতি দায়িত্বে মোহিত রাজি হয়ে যায় কোভিড-১৯ পরবর্তী মনের কষ্ট নিয়ে লিখতে।

স্থবির দাশগুপ্তের বইটি যে ধরনে বানানো হয়েছে, লেখকের কাছে রাখা প্রশ্ন আর লেখকের দেওয়া উত্তর, মোহিতের এই বইটির বেলাতেও তাই।

আমাদের বিশ্বাস এই বইটি পাঠকদের কাজে লাগবে।

কলকাতা
৩ অক্টোবর ২০২০

শুভেন্দু দাশগুপ্ত

▪ **শুভেন্দু দাশগুপ্ত** : মোহিত, এই সময়, এই 'কোভিড ১৯' অসুখের সময়, অনেকে শারীরিক ভাবে সমস্যায় পড়ছে, নানা ভাবে সুস্থ হবার চেষ্টা করছে। অনেকে আবার মানসিক সমস্যাতেও পড়ছে।
একজন মানুষ এই সময় কী কী মানসিক সমস্যায় পড়ছে বলে তুমি জানতে পারছো? একটু বড়ো করে বললে, কী কী সমস্যায় পড়তে পারে বলে তোমার মনে হয়?

▪ **মোহিত রণদীপ** : শুভেন্দু দা, আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে, আমাদের দেশে প্রথম 'কোভিড ১৯'-এর সংক্রমণের খবর আমরা পাই গত ৩০ জানুয়ারি চিনের য়ুহান থেকে কেরলে আসা একজনের মধ্যে। তখনও আমাদের দেশে 'কোভিড ১৯' নিয়ে ভাবনা খুব অল্প কিছু মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। সরকারেরও উচ্চবাচ্য ছিল না। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা এই ভাইরাসের সংক্রমণকে মার্চ মাসের ১১ তারিখে প্যান্ডেমিক বা অতিমারী ঘোষণার পর সংবাদ মাধ্যমে আলোচনা শুরু হলো। সেই আলোচনায় কর্পোরেট হাসপাতালের ডাক্তারবাবুরা বলতে শুরু করলেন। তাঁরা যত বললেন, আমাদের ভয় তত বাড়ল, আমাদের আতঙ্ক ঊর্দ্ধগামী হলো। ধীরে ধীরে 'কোভিড ১৯'-এ সংক্রমণের সংখ্যা আমাদের রাজ্যে বাড়তে শুরু করল। আমরা দেখতে পেলাম, কোভিড ছাড়াও অনেকে অন্য নানা শারীরিক অসুস্থতার কারণে সমস্যায় পড়লেন। অনেকের মধ্যে নানা রকম মানসিক সমস্যাও দেখতে পেলাম আমরা। এই সময়ে, 'কোভিড ১৯' এবং 'লক ডাউন' মানুষের মনের ওপরে প্রভাব ফেললো ভালো মতোই।

- 'ঘরে বন্ধ থেকে বড় অস্থির লাগছে। খবর দেখলে ভয় করছে। খুব চিন্তা হচ্ছে এখন!'
- 'কতদিন চলবে এই পরিস্থিতি। শুনছি নাকি কয়েক মাস ধরে চলতে পারে লক ডাউন।'
- '... ক্রমশ মন খারাপের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছি। বেরোতে হবে, বেরোতে হবে। কবিতা গান দিয়ে আমার হবে না...'
- 'দেখো না, ও সারাদিন শুধু টিভির সামনে বসে থাকছে, আর অ্যাংজাইটির পারদ শুধু চড়ছে, তার সাথে চড়ছে মেজাজও...'
- 'প্রবল দুশ্চিন্তা আর মন খারাপের মধ্যে আছি। মেয়েটা নতুন চাকরিতে জয়েন

করবে বলে ব্যাঙ্গালোরে সেই যে গেল, তার পর দিন থেকেই আটকে পড়লো লক ডাউন-এ। কী যে হবে কে জানে। রাতে ঘুমোতে পারছি না, খেতে বসলে কান্না পাচ্ছে।'

- 'ছেলে আমেরিকার বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষক। গত দু'সপ্তাহ ঘরবন্দি। পরশু একটু জ্বর এসেছিল। অল্প সর্দি-কাশিও রয়েছে। খুব চিন্তায় আছি। স্থির থাকতে পারছি না কিছুতেই।'

...এই কথাগুলো শুনেছি 'কোভিড ১৯' সংক্রমণ এবং 'লক ডাউন' শুরুর দু'তিন সপ্তাহের মধ্যেই আমার খুব কাছের মানুষদের কাছ থেকে। যাঁরা উদ্বেগ উৎকণ্ঠা আর বিষণ্ণতার মধ্যে ছিলেন করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের এই দিনগুলোতে। এখনও অনেকেই মনের এই অবস্থা কাটিয়ে উঠতে পারেননি। কথাগুলোর মধ্যে রয়েছে গভীর অনিশ্চয়তার সঙ্গে উদ্বেগ উৎকণ্ঠা আর বিষণ্ণতার প্রকাশ। এই সময়ে উদ্বেগ উৎকণ্ঠা আর বিষণ্ণতার প্রকোপ অন্য সময়ের তুলনায় অনেক বেশি চোখে পড়ছে।

এছাড়াও বহু মানুষ 'লক ডাউন'-এর সময়ে অর্থনৈতিক ভাবে যেমন বিপন্ন হয়েছেন, তেমনি বিপন্ন হয়েছেন বাড়ি বা নিজের পরিবেশ থেকে দূরে কোথাও পেশাগত বা চিকিৎসা কিংবা অন্য কোনো কারণে আটকে পড়ে। এই মানুষদের বিপন্নতার প্রভাব তাঁদের মনের ওপরেও প্রবলভাবে পড়েছে। চেন্নাইয়ে আটকে পড়া শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলে ওঁদের দু'জন সঙ্গীর মধ্যে বাড়ি ফিরতে না পেরে হতাশ হয়ে আত্মহত্যা করতে চাওয়ার কথা জেনেছিলাম। ওঁদের সঙ্গে নিয়মিত ফোনে যোগাযোগ রেখেছিলাম ওই পর্বে। ডোমকলের এক সদ্য কৈশোর পেরোনো শ্রমিকের কথা জানতে পারি, যিনি ফিরতে না-পেরে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছিলেন।

■ **শুভেন্দু :** যখন কেউ এই সময় মানসিক সমস্যায় পড়ছে, পড়েছে, সে নিজে কীভাবে বুঝতে পারবে?

■ **মোহিত :** সাধারণভাবে উদ্বেগ উৎকণ্ঠা, মন খারাপের মধ্যে দিয়ে কমবেশি আমরা সবাই যাই।

অধিকাংশ সময় তা ক্ষণস্থায়ী। তার তীব্রতাও তেমন থাকে না। আমাদের প্রতিদিনের কাজকর্মে বা অন্যদের সঙ্গে সম্পর্কে তার প্রভাব সেভাবে পড়ে না। কিন্তু, আমাদের কারোর কারোর মধ্যে উদ্বেগ উৎকণ্ঠার কিংবা মন খারাপের মাত্রা তীব্র আকারে দেখা দেয়, চলতে থাকে অনেক দিন ধরে, আমাদের প্রতিদিনের কাজকর্ম-অন্যদের সঙ্গে সম্পর্কের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়তে শুরু করে—তখন তা সমস্যার হয়ে ওঠে। এই করোনা সংক্রমণের সময়ে অনেকের মনের মধ্যেই কিছু দুর্ভাবনা, অনিশ্চয়তা, নানা আশঙ্কার মেঘ জমতে দেখেছি।

- করোনা সংক্রমিত হতে পারি সেই আশঙ্কা!
- যদি 'কোমর্বিডিটি' বা অন্য কোনো শারীরিক সমস্যা (যেমন— ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, শ্বাসকষ্টের অসুখ, কিডনির অসুখ, অতিরিক্ত স্থূলতা প্রভৃতি) থাকে, কমে গিয়ে থাকে রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা, তা নিয়ে আশঙ্কা!
- বাড়িতে থাকা বয়স্ক মানুষদের এবং শিশুদের নিয়ে উদ্বেগ!
- বাড়িতে কারোর একটু জ্বর, সর্দি, কাশি হলেই মনের মধ্যে দেখা দিচ্ছে ভয়, নানা দুর্ভাবনা!
- যদি করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ হয়, সেই আশঙ্কায় নানা দুশ্চিন্তা ভীড় করছে মনে—
    - কেমন করে বুঝবো, করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ কি না? সংক্রমণ হলে কীভাবে টেস্ট করাবো? কোথায় টেস্ট সম্ভব? চিকিৎসার সুযোগ কোথায় পাবো? অ্যাম্বুলেন্স পাবো তো? বেড আছে কিনা কীভাবে জানবো? কত খরচ হবে? চিকিৎসায় আদৌ সেরে উঠবো তো? ...এমন হাজারো চিন্তা, বহু প্রশ্ন মনের মধ্যে উঁকি দিচ্ছে আমাদের অনেকের মনে।
    - করোনা হয়েছে জানলে আশপাশের মানুষ কী আচরণ করবে? একঘরে, অস্পৃশ্য করে দেবে না তো? ঘরে থাকতে বা ঢুকতে দেবে তো? ঝামেলা করবে না তো? করোনা-আক্রান্ত মানুষ এবং তাঁদের পরিবারের অনেককেই এই সব দুর্ভাবনার মধ্যে দিয়েও যেতে হচ্ছে।

মনের মধ্যে জমতে থাকা এই ভাবনাগুলো, এই প্রশ্নগুলো আমাদের মনে উদ্বেগ উৎকণ্ঠার নানা সমস্যার জন্ম দিচ্ছে।

যখন আমরা উদ্বেগ উৎকণ্ঠার মধ্যে থাকি তখন তা বুঝতে পারি কিছু শারীরিক, কিছু মানসিক লক্ষণের মাধ্যমে, আর কিছু আচরণের মাধ্যমে। উদ্বেগ উৎকণ্ঠার সময় আমাদের শরীরে বেশ কিছু অসুবিধা বা লক্ষণ দেখা দেয়। যেমন— বুক ধড়ফড় করা, হাত পা কাঁপা-ঘামতে থাকা-ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া, কান গরম হয়ে যাওয়া, শ্বাস নিতে কষ্ট, শ্বাসপ্রশ্বাসের লয় দ্রুত হওয়া, মুখ শুকিয়ে যাওয়া, পেটের মধ্যে অস্বস্তি, গা গোলানো বা বমি বমি ভাব, মাথা যন্ত্রণা, পিঠে ব্যথা, চোয়াল ব্যথা, শরীরের বিভিন্ন পেশি শক্ত বা টানটান হয়ে আসা, ঘন ঘন প্রস্রাব বা পায়খানা পাওয়া।

এই শারীরিক লক্ষণগুলো সব যে একসঙ্গে দেখা দেয় এমন নয়। কখনো দু-একটি লক্ষণ, কখনো আবার একসঙ্গে অনেকগুলো লক্ষণ দেখা দিতে পারে।

উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় এই শারীরিক লক্ষণগুলো ছাড়াও বেশ কিছু মানসিক লক্ষণও দেখা দেয়। যেমন— একটা অজানা ভয় আর আতঙ্কের অনুভূতি, অতিরিক্ত সতর্কতা,

হঠাৎ ডাকলে চমকে ওঠা, নিরাপত্তাবোধের অভাব, গভীর অনিশ্চয়তার অনুভব, নিজেকে অসহায় এবং বিপদগ্রস্ত মনে করা, উৎকণ্ঠা আর আতঙ্ক নিয়ন্ত্রণ করতে না পারা, সম্ভাব্য বিপদের আশঙ্কায় একেবারে নিশ্চিত হয়ে গিয়ে সেই অনুযায়ী আচরণ করা, কোনো কিছুতে মন দিতে না পারা, ভুলে যাওয়ার প্রবণতা, অস্থিরতা, অস্বস্তিকর অনুভূতি। উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় সাধারণভাবে আমরা দেখি ঘুম আসতে দেরি হয়। কখনো কখনো মাঝ রাত পেরিয়ে যায়। অনিদ্রা, এক বড়ো সমস্যা হিসাবে দেখা দিয়েছে এই কোভিড-পর্বে। একই চিন্তা মনের মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকে, আর অবশ্যই সেই চিন্তা নানা আশঙ্কাকে ঘিরে। উদ্বেগ উৎকণ্ঠা-র প্রকাশও এক এক জনের ক্ষেত্রে এক এক রকম আমরা দেখতে পাই।

কিছু মানুষের মধ্যে নানা বিষয়ে উদ্বেগ উৎকণ্ঠা চলতেই থাকে, শুধু কারণগুলো বদলে যেতে থাকে। এই কোভিড সংক্রমণের সময়ে বিশেষ করে চোখে পড়েছে— বাড়ির বাইরে যেতে হলে ভয়, কাজে যাওয়া নিয়ে ভয়, কেউ বাড়িতে এলে ভয়, কেউ বাড়িতে ফিরতে দেরি করলে দুশ্চিন্তা, খবরের কাগজে কোনো খবর দেখে আশঙ্কায় পড়া কিংবা টেলিভিশনের খবর বা কোনো অনুষ্ঠান দেখে অতিরিক্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়া। এইভাবে কারণ বদলে যেতে থাকে, কিন্তু উৎকণ্ঠা, ভয়, আশঙ্কা চলতে থাকে কারোর কারোর মধ্যে।

কারোর আবার নির্দিষ্ট কিছু নিয়ে আশঙ্কা এবং সেই আশঙ্কা থেকে সেই জিনিসকে এড়িয়ে চলার প্রবণতা। এই কোভিড-পর্বে আমরা দেখেছি কিছু মানুষ 'কোভিড-আক্রান্ত' এবং তাঁদের পরিবারের লোকজনকে দেখলে রীতিমতো আতঙ্কিত হয়েছেন। যাঁরা কোভিড-চিকিৎসা পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত সেই চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী, অ্যাম্বুলেন্স চালক, সাফাই কর্মী...এঁদের প্রতিও একই রকম অস্বাভাবিক অযৌক্তিক আচরণ করেছেন বেশ কিছু মানুষ। যাঁরা এই আচরণ করেছেন তাঁদের কারোর কারোর মধ্যে আমরা ফোবিয়া বা অমূলক ভয়ের কারণে অস্বাভাবিক আতঙ্কের সমস্যা খুঁজে পেতে পারি। কোভিড চিকিৎসা কেন্দ্রকে দেখে ভয়, কোভিড চিকিৎসা কেন্দ্রের অ্যাম্বুলেন্স দেখে ভয়, কোভিড-এ আক্রান্ত ব্যক্তির মৃতদেহ দেখে অস্বাভাবিক ভয়। এসবের মূলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে থাকতে পারে ফোবিয়ার ভূমিকা।

উদ্বেগ উৎকণ্ঠা-র আর একটি প্রকাশ এই সময়ে খুব বেশি করে চোখে পড়ছে, তা হোল একই চিন্তা মনের মধ্যে বার বার আসতে থাকা, আর সেই চিন্তার সাপেক্ষে, একই আচরণ বার বার করতে থাকা। কোভিড সংক্রমণ শুরু হওয়ার সময় থেকে আমরা মোবাইল ফোন হাতে নিয়ে কারোকে ফোন করতে গেলেই শুনতে হয় কোভিড-সংক্রান্ত নানা সাবধানবাণী। তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি হলো, 'বার বার

হাত ধোন'। এই বার বার হাত ধোয়া বলতে ঠিক কী বোঝায়? যতক্ষণ ঘরে বসে আছি, যেভাবেই থাকি না কেন—উঠে বার বার সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে আসবো? কত বার ধোবো? কখন ধোবো, আর কখন ধোয়া আদৌ জরুরি নয়? এ-সম্পর্কে খুব স্পষ্ট করে কিছু বলা হয় না। এর ফলে কিছু মানুষ যাঁরা আগে থেকেই বারংবার হাত ধুতে এবং সবকিছু অতিমাত্রায় পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে অভ্যস্ত তাঁদের উদ্বেগ উৎকণ্ঠার কারণেই—তাঁদের সমস্যা আরও বেড়েছে। নতুন করেও অনেকের মধ্যে এই সমস্যা দেখা দিয়েছে। এই অসুখটি মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞানে উদ্বেগ উৎকণ্ঠার একটি অসুখ হিসাবেই চিহ্নিত, যা 'অবসেসিভ কম্পালসিভ ডিসঅর্ডার' হিসাবে পরিচিত। এই অসুখে কোনো চিন্তা মনের মধ্যে ঢুকলে সহজে বেরোতে চায় না, একই চিন্তা আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাদের মনে বার বার আসতে থাকে, এর ফলে একই কাজ অনেক সময় অনিচ্ছা সত্ত্বেও বার বার কিংবা দীর্ঘক্ষণ ধরে করতে বাধ্য হই আমরা। হাতটা ধোয়ার পরেও মনে হয়, 'ঠিক মতো ধোওয়া হলো না', ফলে তা বার বার ধুতে হয়। কোনো কিছু পরিষ্কার করার পরেও মনে হয়, 'ঠিক মতো হলো না'। আলো-পাখার সুইচ, তালা বন্ধ করার পরে বা যে কোনো কাজ করার পরেও মনে হয়, 'ঠিক মতো হলো না'! আবার তা না-করলে মনে শান্তি আসে না! অন্যদের করা কাজে সন্তুষ্ট হতে পারি না এই সমস্যা থাকলে। একই কাজ বার বার করতে গিয়ে দীর্ঘক্ষণ ধরে চলতে থাকে। কোনো কিছু সময়ে শেষ করা কঠিন হয়ে পড়ে!

এই কোভিড-পর্বে এমন অনেক ঘটনা ঘটেছে যার ফলে অনেকের মনে দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতও তৈরি হয়েছে। তা কোভিড সংক্রমণকে ঘিরে যতটা হয়েছে, তার থেকে অনেক বেশি হয়েছে 'লক ডাউন'-এর ফলে! প্রবাসে আটকে পড়া মানুষ, বিশেষত শ্রমিকদের অনেকেই বিপর্যয়ের মধ্যে পড়েছেন নানাভাবে, সেই সব বিপর্যয়ের ক্ষত তাঁদের মনের মধ্যে যেমন উদ্বেগ উৎকণ্ঠার নানা লক্ষণের জন্ম দিয়েছে, তেমনি বিষণ্ণতারও। সেই সব বিপর্যয়ের অভিজ্ঞতা তাঁদের মনের মধ্যে জেগে থাকা বা ঘুমন্ত অবস্থায় বার বার ফ্ল্যাশব্যাকের মতো ফিরে ফিরে আসে! বিপন্ন বোধ করেন তাঁরা, আতঙ্কিত হয়ে পড়েন সেই সব ভয়াবহ অভিজ্ঞতার স্মৃতিতে। 'কোভিড ১৯' এবং 'লক ডাউন'-এর বিপর্যয়-পরবর্তী মানসিক ক্ষতের পরিমাপ আদৌ কোনো দিন সম্ভব হবে কিনা জানি না! কিন্তু, এই পরিমাপ হওয়া জরুরি।

উদ্বেগ উৎকণ্ঠা-র এই সমস্যাগুলো ছাড়াও আমরা এই সময়ে অনেকের মধ্যে দেখেছি মানসিক কারণ থেকে নানা শারীরিক উপসর্গের লক্ষণ। নির্দিষ্ট শারীরিক কারণ ছাড়াই শরীরের বিভিন্ন জায়গায় ব্যথা-যন্ত্রণা, পেটের নানা সমস্যা, শ্বাসকষ্ট, প্রস্রাবে জ্বালা অনেকের মধ্যেই চোখে পড়েছে। পেটের গ্যাস-অম্বলের বেশিরভাগ

সমস্যার ক্ষেত্রেই মানসিক নানা কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে।

করোনা সংক্রমণের এই সময়ে অল্প বিস্তর মন খারাপ আমাদের অনেকের মধ্যেই দেখা দিয়েছে। কিন্তু, কারোর কারোর ক্ষেত্রে তার মাত্রা ও তীব্রতা অনেক বেশি, স্থায়িত্বও তুলনায় বেশি। চিন্তা ভাবনা থেকে শুরু করে পারস্পরিক সম্পর্ক, কাজকর্ম... সব কিছুকেই প্রভাবিত করেছে। মন খারাপের তীব্রতা অনেক বেশি থাকার ফলে কিছুই ভালো লাগে না। কারোর সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করে না, শব্দ বা আলো সহ্য হয় না। শরীরে কোনো উদ্যম বা এনার্জি থাকে না। ঘুম বা খিদে স্বাভাবিক থাকে না। সব সময় দু'চোখ বন্ধ করে, ঘর অন্ধকার করে শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। মাঝ রাতে বা ভোর রাতে ঘুম ভেঙে যায়। এই অবস্থায় যত 'নেগেটিভ' চিন্তা এসে মনের মধ্যে ভীড় করে। নিজেকে 'অপদার্থ' মনে হয়, যেন জীবনটাই ব্যর্থ হয়ে গেল। সব বিপত্তির জন্য নিজেকেই দায়ী মনে হয়। বড় একা লাগে নিজেকে, মনে হয়, 'কেউ পাশে নেই', 'কেউ বোঝে না আমাকে'। খুব অসহায় লাগে। ভবিষ্যতের দিকে, সামনে তাকালেও সব কিছু অন্ধকার লাগে, কোথাও আলোর চিহ্ন চোখে পড়ে না। বড় হতাশ লাগে। এই পরিস্থিতিতে অনেক সময় উঁকি দেয় দূরে কোথাও চলে যাওয়ার কিংবা নিজেকেই শেষ করে দেওয়ার ভাবনাও। তীব্র এবং দীর্ঘস্থায়ী মন খারাপের এই অবস্থা মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞানে 'বিষণ্ণতা' বা 'ডিপ্রেশন' হিসাবে চিহ্নিত।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলা জরুরি, বিষণ্ণতায় যে নেগেটিভ বা নেতিবাচক চিন্তাগুলো মনের মধ্যে হানা দেয়, তা বেশিরভাগ সময়ই দীর্ঘস্থায়ী নয়। বিষণ্ণতার প্রকোপ কমলেই এই চিন্তাগুলোও আর থাকে না। কিন্তু, অনেকেই এই সাময়িক মানসিক পরিস্থিতির কারণে হঠকারী কিছু সিদ্ধান্ত নিয়ে বসেন, যা পরে সংশোধনের কোনো সুযোগ থাকে না।

যে ক'টা সমস্যার কথা বললাম, সেগুলো শুধু বড়দের মধ্যেই দেখা যাচ্ছে তা নয়, কমবয়সী ছেলেমেয়েদের মধ্যেও আমরা এগুলো দেখতে পাচ্ছি। উদ্বেগ উৎকণ্ঠা, মানসিক কারণে নানা রকম শারীরিক উপসর্গ, বিষণ্ণতা কমবয়সীদের মধ্যেও দেখা যায়, যেগুলো সম্পর্কে আমরা বড়রা সেভাবে সচেতন থাকি না, বুঝতে চাই না। আমরা ওদের অতি দুরন্তপনা, পড়াশোনায় অমনোযোগ-অনীহা, অবাধ্যতা, জেদ, মুখে মুখে তর্ক, মোবাইল ফোনে আসক্তির মতো আচরণের সমস্যাগুলো নিয়ে যতটা সোচ্চার হই, ততটা সংবেদনশীল নই ওদের আবেগ-অনুভূতির সমস্যাগুলো নিয়ে। যদিও ওদের এই আচরণের সমস্যাগুলোর ক্ষেত্রে আমাদের বড়দের ভূমিকা কম নয়। এমনিতেই ছোটদের স্বতঃস্ফূর্ত খেলাধুলোর বিকেলটা চুরি হয়ে গেছে। তাদের ভিতরের জমে থাকা এনার্জি বহিঃপ্রকাশের জায়গা আবদ্ধ হয়েছে চার দেয়ালের

মধ্যে। আর, এই 'লক ডাউন'-এর সময়ে তারা পুরোপুরি ঘরবন্দি। তার ফলে আমরা ওদের দুরন্তপনাটুকুই দেখতে পাই। শৈশবে টেলিভিশনের কার্টুন নেটওয়ার্ক আর মোবাইল ফোনে রাইমস্ শেখানোর ফলে তাদের অনেকের মধ্যে দেখছি আমরা, মনঃসংযোগের সমস্যা। ডিজিটাল স্ক্রিনে গতিশীল অনুষ্ঠান দেখতে অভ্যস্ত মন সাদা পাতায় কালো অক্ষরে ছাপা স্থির কোনো লেখায় মন দিতে অসুবিধায় পড়বে, এটা খুব অস্বাভাবিক নয়। বয়ঃসন্ধির ছেলেমেয়েদের 'জেদ' বা 'মুখে মুখে তর্ক'-র ক্ষেত্রেও আমরা মনে রাখি না, এর কোনোটাই আমাদের বড়দের সঙ্গত ছাড়া সম্ভব নয়। শাস্ত্রীয় সংগীতের যুগলবন্দির মতোই।

- **শুভেন্দু** : তুমি যে যে চিহ্নের কথা, অবস্থার কথা বললে, তা কেন হচ্ছে? বা আর একটু ঠিকঠাক করে বললে, এই সময় মনের অসুখ হবার কী কী কারণ তৈরি হলো, হচ্ছে?

- **মোহিত** : মন কী? মনের সমস্যা কেন হয়? আমাদের শরীরের ভিতর, না বাহির—কোনটা দায়ী?

...এই প্রশ্নগুলো নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে নানা মত আছে, শুভেন্দু দা। সর্বজনগ্রাহ্য কোনো সংজ্ঞায় এখনও পৌঁছোনো সম্ভব হয় নি। কিন্তু, আমরা যারা মানসিক স্বাস্থ্যকে ইন্টিগ্রেটেড বা সমন্বিত বিষয় হিসাবে দেখি, আমরা মনে করি, আমাদের ভিতরে কিছু উপাদান আছে, যেমন—বংশগত বৈশিষ্ট্য, আমাদের শৈশব অভিজ্ঞতা, আমাদের বংশগত বৈশিষ্ট্য-শৈশব অভিজ্ঞতা ও পরিবেশের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা মানসিক গঠন, মস্তিষ্ক, স্নায়ুতন্ত্র আর শরীরের মধ্যেকার বিভিন্ন জৈব রাসায়নিক বা নিউরোট্রান্সমিটার, যেগুলোকে বাংলায় আমরা স্নায়ুপ্রেরক বলে থাকি। এই ভিতরের উপাদানগুলোর সঙ্গে আমাদের চারপাশে ঘটতে থাকা ঘটনাপ্রবাহের প্রতিনিয়ত আদানপ্রদান চলতে থাকে, সেই আদানপ্রদানের প্রকাশ আমরা মনের বিভিন্ন কাজের মধ্য দিয়ে দেখতে পাই। মনের সেই প্রকাশ আমরা বুঝতে পারি, আমাদের চিন্তা ভাবনা, আমাদের আবেগ অনুভূতি, আমাদের প্রত্যক্ষণ বা পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়ে যা কিছু অনুভব করি এবং আচরণের মধ্য দিয়ে। যখন আমাদের মনের কোনো সমস্যা হয়, তখন এগুলোর ওপর কোনো না কোনোভাবে প্রভাব পড়ে। তাই মনের সমস্যার ক্ষেত্রে শুধু আমাদের অভ্যন্তরের বা ভিতরের নয়, আমাদের চারপাশে ঘটতে থাকা ঘটনাগুলোর ভূমিকাও অনেকখানি।

'কোভিড ১৯'-এর সংক্রমণ এবং 'লক ডাউন' আমাদের শরীর-মন-পারস্পরিক সম্পর্ক-পেশাগত জীবন-অর্থনৈতিক পরিস্থিতি...সব কিছুকেই প্রভাবিত করেছে। প্রথমত, দ্রুত নিজেকে বদলাতে থাকা 'কোভিড ১৯' নামের এই ভাইরাসের গতিপ্রকৃতি

সম্পর্কে সঠিক ধারণা না পাওয়া, এর সংক্রমণ রুখতে প্রথম দিকে আমাদের দেশের কেন্দ্রীয় সরকারের অদ্ভুত উদাসীনতা-অবহেলা, পরে আবার হঠাৎ করে ঘুম থেকে জেগে উঠে 'লক ডাউন'-এর বজ্র-আঁটুনি, দেশের এবং বিদেশের বিভিন্ন প্রান্তে কয়েক কোটি মানুষের আটকে পড়া, বিশেষ করে সর্বস্বান্ত প্রবাসী শ্রমিকদের, দেশের অতি নগণ্য বাজেট বরাদ্দের ফলে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার বেহাল দশা, জনস্বাস্থ্য 'মস্ত্রক' থাকলেও— কার্যত প্রয়োজনীয় উদ্যোগ না-থাকা, চিকিৎসার সুযোগ পাওয়া নিয়ে অনিশ্চয়তা, সামাজিক হেনস্থার আশঙ্কা, 'মাস মাইনে না-থাকা' মানুষের উপার্জনের সব পথ বন্ধ হয়ে যাওয়া, অর্থনৈতিক সংকট, কাজ হারানোর আশঙ্কা, চাষাবাদের ক্ষেত্রে নানা সমস্যা, পড়ুয়াদের লেখাপড়া-পরীক্ষা-রেজাল্ট নিয়ে অনিশ্চয়তা, সব মিলিয়ে গভীর এক অনিশ্চিত পরিস্থিতি তৈরি হওয়া। এর পাশাপাশি যেখানে সরকারের দায়িত্ব ছিল দেশের, রাজ্যের বিপন্ন মানুষের পাশে দাঁড়ানো, সেখানে কেন্দ্রীয় সরকার 'কোভিড ১৯' সংক্রমণের শুরু থেকেই ব্যস্ত হয়ে পড়ল দেশের মানুষের স্বার্থের বিরুদ্ধে গিয়ে কর্পোরেট এবং ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার স্বার্থে একের পর এক সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে। আর, রাজ্য সরকার তার রেশন ব্যবস্থা, পঞ্চায়েত-পুর ব্যবস্থা ও প্রশাসনের অন্যান্য স্তম্ভের ওপর আস্থা হারিয়ে শুধুমাত্র পুলিশি ব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়লো প্রায় সব ক্ষেত্রে। এর ফলে বহু মানুষকে দুর্বিষহ সমস্যার মধ্যে পড়তে হলো। দেশের মধ্যে সাকুল্যে তিরিশ শতাংশ পরিবারে কম্পিউটার বা স্মার্ট ফোন থাকা সত্ত্বেও সব শিশুর জন্য কম্পিউটার বা স্মার্ট ফোন-নির্ভর 'অন লাইন' পড়াশোনার প্রহসন শুরু হলো সরকারি স্কুল-কলেজেও। স্মার্ট ফোনের অভাবে 'অন লাইন ক্লাস' করতে না-পেরে আত্মহত্যার একাধিক ঘটনার কথাও জেনেছি আমরা এই সময়ে। এক বিপুল সংখ্যক গরীব ছাত্রছাত্রীদের প্রতি এই নগ্ন বৈষম্য এই সময়ের আর এক 'অর্জন'।

এইসব ঘটনাপ্রবাহ মনের মধ্যে ছাপ ফেলে, বিপন্ন করে তোলে আমাদের মনকে। দেখা দেয় আমাদের মনে উদ্বেগ উৎকণ্ঠা, বিষণ্ণতা...

■ **শুভেন্দু** : তোমার বলে দেওয়া কারণগুলোর কোনটার জন্য অর্থনীতি দায়ী, কোনটার জন্য এখনকার সামাজিক পরিবেশ, কোনটার জন্য রাজনৈতিক অবস্থা, প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা দায়ী, কোনটার জন্য চিকিৎসা ব্যবস্থা?

আমি জানি, তুমি বলবে এভাবে আলাদা আলাদা করা যায় না, জড়িয়ে থাকে। তোমাকে আলাদা করে বলতে হবে তার কোনো মানে নেই। যদি আলাদা করতে পারো কোরো, নয়তো মিলিয়ে বলো। আমার এভাবে বলার যুক্তিটা হলো এই রকম—ধরা যাক, প্রশাসনিক কারণ দায়ী, তাহলে আমরা প্রশাসনকে বলতে পারি, এইগুলো মেরামত করা দরকার, না হলে নাগরিকদের মানসিক সমস্যা দেখা দিচ্ছে।

আমি কি আমার প্রশ্নটা তোমার কাছে ঠিকঠাক রাখতে পারলাম? নাকি জট পাকিয়ে ফেললাম?

▪ **মোহিত** : আপনার এই কথাগুলোর কিছুটা উত্তর আমার আগের কথার মধ্যে রয়েছে, শুভেন্দু দা।

এরপরেও কিছু কথা অবশ্যই বলার থেকে যায়। শুধু আমাদের রাজ্য, পশ্চিমবঙ্গ থেকেই বহু মানুষ, আনুমানিক প্রায় কুড়ি লক্ষ মানুষ, নিজের গ্রাম বা শহর ছেড়ে দূরে যেতে বাধ্য হন কাজের খোঁজে। এঁদের বড় অংশই অসংগঠিত ক্ষেত্রে শ্রমিক হিসাবে কাজ করেন। কেউ মুম্বইয়ে যান, কেউ দিল্লিতে, কেউ চেন্নাইয়ে, কেউ ব্যাঙ্গালোরে, কেউ হয়তো অন্য কোথাও। এই 'লক ডাউন'-এর সময়ে সারা ভারতে সরকারের হিসাব মতো এক কোটিরও বেশি প্রবাসী শ্রমিক জাতীয় সড়ক ধরে পায়ে হেঁটে বাড়ি ফিরতে চেষ্টা করেছেন। আসল সংখ্যা হয়তো আরও অনেক বেশি। এই বিপুল সংখ্যক শ্রমজীবী মানুষের অস্তিত্ব সম্পর্কে আমরা তেমন করে কিছু জানতামই না! জানতে পারলাম, যখন 'লক ডাউন'-এ তাঁরা বিভিন্ন জায়গায় আটকে পড়লেন! যখন আমরা দেখলাম অস্থায়ী থাকার জায়গা থেকে উৎখাত হয়ে, ঠিক মতো খাবার না-পেয়ে তাঁরা মরিয়া হয়ে 'দেশে' বা নিজেদের গাঁয়ে ফিরতে চাইলেন। যখন তাঁরা পায়ে হেঁটে কয়েক শ' মাইল পেরোতে গিয়ে একের পর এক মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হলেন। এই বিপুল সংখ্যক মানুষের অস্তিত্ব সম্পর্কে কোনো ধারণা ছিল না বা ধারণা থাকলেও তাঁদের জন্য তেমন কোনো উদ্যোগ ছিল না সরকার, এনজিও, সংবাদ মাধ্যম, ট্রেড ইউনিয়ন, রাজনৈতিক দল—কারোরই! সরকারের ভূমিকা এককথায় চূড়ান্ত অমানবিক থেকেছে এই পর্বে। আমরা যারা নাগরিক ও মানবাধিকার আন্দোলনের সঙ্গে কোনো না কোনোভাবে যুক্ত, আমরাও উদাসীন থেকেছি তাঁদের সম্পর্কে। কোনো প্রশ্ন তুলিনি, কেন এই মানুষদের কর্ম-সংস্থানের জন্য ছুটে যেতে হবে নিজের গ্রাম, নিজের শহর, নিজের জেলা ছেড়ে দূর দূরান্তে? তাঁদের জন্য সরকারের নানা প্রকল্প থাকা সত্ত্বেও কেন তাঁরা সেইসব কর্মসংস্থানের প্রকল্প থেকে-আত্মনির্ভরশীল হয়ে আত্মসম্মানের সঙ্গে বাঁচার অধিকার থেকে বঞ্চিত হবেন? কেন প্রবাসী শ্রমিকের জন্য কর্মক্ষেত্রে বা তার আশপাশে আইনসিদ্ধ বসবাসের অধিকার থাকবে না? কেন বঞ্চিত হবেন তাঁরা খাদ্য নিরাপত্তা থেকে, চিকিৎসা পাওয়ার অধিকার থেকে?

...এই প্রশ্নগুলো যদি আমরা আগেই তুলতে পারতাম, তাহলে, কেন্দ্রীয় বা রাজ্য, কোনো সরকারই প্রবাসী কয়েক কোটি আমাদের সহনাগরিক শ্রমিকদের প্রতি এতখানি নির্মম উদাসীনতা দেখানোর সাহস পেতো না।

আপৎকালীন পরিস্থিতিকে সামাল দেওয়ার জন্য দু'খানা বেশ শক্তপোক্ত আইন

আমাদের দেশে সরকার করে রেখেছে, ব্রিটিশ শাসনকালে একটি, অন্যটি সাতচল্লিশ পরবর্তীতে। একটি হল 'এপিডেমিক ডিজিজ অ্যাক্ট ১৮৯৭', অন্যটি হল, 'ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্ট ২০০৫'। কোভিড সংক্রমণের সময়ে, এই দুটি আইনের বলে আমাদের সরকার তথা রাষ্ট্র হয়ে উঠল সর্বশক্তিমান। আইনের অপব্যবহারের ঘটনা আমরা কম দেখলাম না। অসহায় প্রবাসী শ্রমিকেরা যখন পায়ে হেঁটে কয়েক শ' মাইল পাড়ি দিলেন, তখন তাঁরা দিনের বেলায় প্রখর রোদ থেকে বাঁচতে বিকাল থেকে হাঁটা শুরু করলেন। তাঁদের আটকাতে আমাদের দেশের সরকার বিকাল পাঁচটা থেকে পথে বেরোনোয় নিষেধাজ্ঞা জারি করল। জারি হলো, 'সান্ধ্য কারফিউ'। গরীব মানুষের প্রতি রাষ্ট্রের আসল দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট হয়ে গেল। আমাদের রাজ্যে, হাওড়া জেলায় শিশুর জন্য দুধের খোঁজে বেরোনো একজন মানুষকে পুলিশ পিটিয়ে মারল। নির্দিষ্ট প্রয়োজনে বাইরে বেরোনো অনেক মানুষও নির্মম মারধরের শিকার হলেন পুলিশের হাতে। আমাদের মধ্যে অনেকে আবার এতে পুলিশকে বেশ বাহবা দিলেন। এক্ষেত্রে যিনি মার খেলেন, যে কারণে মার খেলেন, মার খাওয়ার পর তাঁর মনে যে মানসিক পরিস্থিতি তৈরি হল, সে সব সম্পর্কে আমরা ভেবেও দেখলাম না। ভেবে দেখলাম না, মার খাওয়া ওই মানুষটা আমি বা আমার কাছের কিংবা পরিবারের কেউ হলে আমার কেমন লাগত। পুলিশ এভাবে আইন নিজের হাতে নিতে পারে কিনা, পুলিশের হাতে এমন ক্ষমতা থাকা আদৌ ঠিক কিনা—ভেবে দেখলাম না এই প্রশ্নগুলোও। নাগরিক সমাজের এই তলিয়ে না-ভাবার, গভীরে গিয়ে না-ভাবার পরিণতি যে নাগরিকদেরই ভুগতে হবে একদিন, তা আমরা আগামী দিনে হয়তো নিজেদের অভিজ্ঞতা দিয়েই বুঝবো। কিন্তু, ততদিনে হয়তো দেরি হয়ে যাবে অনেকটাই।

গত ১১ মার্চ ২০২০, যখন বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা 'কোভিড ১৯'-এর সারা বিশ্ব জুড়ে সংক্রমণকে 'প্যান্ডেমিক' বা অতিমারী হিসাবে ঘোষণা করলো, তার দু'দিনের মাথায় আমাদের দেশের স্বাস্থ্য সচিব ঘোষণা করলেন, আমাদের দেশে 'কোভিড ১৯' এখনও কোনো জরুরি পরিস্থিতি নয়। 'ডিজাস্টার প্রিপেয়ার্ডনেস' বা বিপর্যয় মোকাবিলায় প্রস্তুতি বলে যে একটা বিষয় আছে সেটা বোধহয় আমাদের দেশের স্বাস্থ্য দপ্তর, দেশের সরকার ভুলেই গিয়েছিল। সেই পর্বে আমাদের সরকার দেশেরই একটি বড় অংশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাগরিককে, যে নাগরিকের ভোটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে সরকার তৈরি হয়, 'অনাগরিক'-এ পরিণত করে জার্মানির নাৎসি শাসকদের অনুকরণে 'ডিটেনশন ক্যাম্প'-এ পাঠাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল, এর প্রতিবাদে গড়ে ওঠা শাহীনবাগ এবং অন্যান্য প্রতিবাদকে স্তব্ধ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল, ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল বিপক্ষের এম.এল.এ.-দের নিজের আয়ত্তে এনে ছত্তিশগড়ের শাসন ক্ষমতা

দখল করতে। ফলে এই 'কোভিড ১৯' অতিমারীকে সামাল দেওয়ার কোনো প্রস্তুতি নিতে পারেনি সরকার। সামাল দিতে চেয়েছে হঠাৎ ডাকা 'লক ডাউন', 'বিপর্যয় মোকাবিলা আইন', 'মহামারী আইন' আর চূড়ান্ত অবহেলিত স্বাস্থ্য পরিকাঠামো দিয়ে। আমাদের দেশে স্বাস্থ্যের থেকে পাঁচগুণ গুরুত্ব পায় প্রতিরক্ষা। স্বাস্থ্য বাজেটে বরাদ্দ হয় ১.২৮ শতাংশ। এর অবধারিত পরিণতি যা হওয়ার তা আমরা খুব ভালো রকম টের পেলাম এই কোভিড সংক্রমণের পর্বে। কেন্দ্র এবং রাজ্য, দুই সরকারই, প্রথম দিন থেকেই নানাভাবে তথ্য গোপন করেছে, পর্যাপ্ত সংখ্যায় টেস্ট যাতে না হয়, টেস্ট হলেও তুলনামূলক ভাবে গ্রহণযোগ্য RT-PCR Test নয়, কম ভরসা জনক Rapid Antigen Test করার ওপর গুরুত্ব দিয়েছে। খরগোশের মতো গর্তের মধ্যে মুখ ঢুকিয়ে দিয়ে বলতে চেয়েছে, কোথাও কোনো বিপদ নেই। বলতে চেয়েছে, কোভিডের বিরুদ্ধে আমরা কত সফল! 'কোভিড ১৯'-এ মৃত্যু হার অন্যান্য অনেক অসুস্থতা থেকে অনেক কম থাকলেও, ১ থেকে ৩ শতাংশ আমাদের দেশের জনসংখ্যার বিচারে নেহাৎ কম নয়!

জনস্বাস্থ্য নিয়ে উদ্যোগ যে একেবারে কম তা আগেই বলেছি। আমাদের দেশে উদার অর্থনীতির দৌলতে স্বাস্থ্যের বাণিজ্যকরণ ঘটেছে ভালো মতোই। কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের ধারণা থেকে ডান-বাম নির্বিশেষে এ-দেশের প্রায় সব শাসকদলই মুক্তি চেয়েছে। তারা পুষ্টি, শিক্ষা, স্বাস্থ্যের দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলতে চেয়েছে নানা অজুহাতে। পিপিপি বা 'পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ' এর জ্বলন্ত উদাহরণ। ফলে গুরুত্ব পায়নি রোগপ্রতিরোধের জনস্বাস্থ্য উদ্যোগ, গুরুত্ব পেয়েছে ক্লিনিক বা হাসপাতাল-নির্ভর রোগ মুক্তির বা উপশমের চিকিৎসা, কারণ তা লাভজনক। সরকারের কাছ থেকে নামমাত্র মূল্যে নেওয়া জমিতে গড়ে ওঠা কর্পোরেট হাসপাতাল এই কোভিড সংক্রমণের সময়েও যে ধরনের বিল ধরিয়েছে চিকিৎসা-প্রার্থীর হাতে তা শুধু 'অমানবিক' বললে কম বলা হয়! 'কোভিড ১৯' এবং 'লক ডাউন'-এর সময়ে বিশেষভাবে আমরা উপলব্ধি করলাম জনস্বাস্থ্যের উদ্যোগ কতটা জরুরি। জনস্বাস্থ্য বলতে শুধু পানীয় জল সরবরাহ কিংবা স্যুয়ারেজ সিস্টেম নয়! জনস্বাস্থ্য বলতে আমরা এর সঙ্গে বুঝি, সবার জন্য পর্যাপ্ত সুষম খাদ্যগুণ সম্পন্ন পুষ্টির নিশ্চয়তা, খাদ্যের অধিকার; স্বচ্ছ পানীয় জল; শিক্ষা—যার লক্ষ্য শুধু কর্মসংস্থান নয়, যা নিজের ও নিজের চারপাশ সম্পর্কে দায়িত্বশীল করে তোলে, সহমর্মী করে তোলে; প্রতিটি মানুষের জন্য বিনামূল্যে বিজ্ঞানসম্মত ও মানবিক চিকিৎসা; শরীর এবং মনের স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তোলা ও তা ভালো রাখার সামাজিক উদ্যোগ।

মানসিক স্বাস্থ্যেরও prevention এবং promotion-এর বিষয় নিয়ে ভাবনা প্রয়োজন। স্কুল-স্তর থেকেই সেই ভাবনা জরুরি। সুইসাইড বা আত্মহনন যতটা 'ক্লিনিক্যাল ইস্যু', তার থেকে একটুও কম নয় 'সোশ্যাল'। এই 'কোভিড ১৯'-ও যতটা চিকিৎসাকেন্দ্রিক, তার থেকে একটুও কম মনস্তাত্ত্বিক এবং সামাজিক বিষয় নয়।

শুধুমাত্র চিকিৎসা পরিষেবা দিয়ে যে কোভিড ১৯-কে সামাল দেওয়া যায় না, তা আমরা এখন ভালোই উপলব্ধি করতে পারছি। এর সঙ্গে জড়িয়ে থাকা মনস্তাত্ত্বিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক দিকগুলোকে নিয়ে না-ভেবে আর উপায় নেই।

তাই মানসিক স্বাস্থ্যকে কীভাবে সামগ্রিক জনস্বাস্থ্য ভাবনার পরিসরে আনা যায়, সেই ভাবনা এবং উদ্যোগ এখনই শুরু হওয়া জরুরি।

আমাদের দেশে কখনো কোনো ভোটে তেমন ভাবে খাদ্য নিরাপত্তা-পুষ্টি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কর্মসংস্থান এবং পরিবেশ এজেন্ডা হয়ে ওঠে না। অথচ এগুলো মানুষের ভালোভাবে বেঁচে থাকার জন্য সবচেয়ে জরুরি। সমস্ত রাজনৈতিক দলের কাছেই এই এজেন্ডাগুলো জোরালো ভাবে তুলে ধরার দায়িত্ব আজ সমাজ সচেতন প্রতিটি মানুষ এবং সংগঠনের। রাষ্ট্র যেখানে তার দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে চায়, মানুষের ভালোভাবে বেঁচে থাকার অধিকার কেড়ে নেওয়ার পরিকল্পনা করে, তখন স্পষ্টভাবে-দৃঢ়তার সঙ্গে তা বলা জরুরি হয়ে দাঁড়ায়। যদিও এসব নিয়ে কথা বলতে গেলেই সরকারের কাছ থেকে জুটবে 'মাওবাদী' বা 'দেশদ্রোহী' তকমা, যেতে হতে পারে জেলেও। কিন্তু, এই সত্যিগুলো জোরালো ভাবে বলা ছাড়া আমাদের অন্য কোনো উপায় নেই।

এত দিন আমরা দেখে এসেছি, আমাদের দেশে সরকার যখন তার দায়িত্ব পালনে অবহেলা করে বা ব্যর্থ হয়, তখন মানুষ নির্ভর করতে চায় জুডিসিয়ারি বা আদালতের ওপর। কোভিড-পর্বে আমরা দেখলাম রাষ্ট্র ব্যবস্থার এই গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানটিও সম্পূর্ণভাবে মানুষের আস্থা হারাল। শাসকের সমস্ত জনবিরোধী ইচ্ছাপূরণের হাতিয়ার হয়ে উঠল আদালত। শাসকের মুখ চেয়ে প্রতিবাদীদের নানা অজুহাতে জামিন না দিয়ে জেলে বন্দি করে রাখার দায়িত্ব নিল আদালত। সরকারের বিরুদ্ধে দায়ের করা মোকদ্দমা চাপা দিয়ে রাখল। আদানির পক্ষে আটটি মামলার রায় লিখে এক বিচারপতি সুপ্রিম কোর্ট থেকে অবসর নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সেই আদানির সংস্থাতেই আইনী পরামর্শদাতা হিসাবে যোগ দিলেন। এক অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি রামমন্দির মামলার রায় শাসকের পক্ষে দিয়ে রাজ্যসভায় মনোনীত হলেন। বিচারব্যবস্থা যে কতখানি প্রহসনে রূপান্তরিত তা আরও স্পষ্ট করে দিয়েছেন প্রতিবাদী আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ।

আমি জানি না, শুভেন্দু দা, আপনি যা জানতে চাইলেন আপনার প্রশ্নে, তা ঠিক মতো বলে উঠতে পারলাম কিনা।

■ শুভেন্দু : এই কোভিড ১৯ অসুখটা কেউ আমাদের ঠিকঠাক বুঝিয়ে বলছে না। অসুখটা হয়েছে জানবো কীভাবে? কাকে বলবো? কোথায় যাবো? কে আমার জন্য করবে? এই অসুখটা যাতে না হয়, তার জন্য আমার কী কী করা দরকার?

নানা জায়গা থেকে প্রতিদিন নানা কথা আসছে। প্রশাসন, পুঁজি, সংবাদপত্র, টেলিভিশন, বিজ্ঞাপন, হাতে ধরে রাখা ফোনে, নানা মাধ্যমে, বলেই চলেছে যে যার মতন করে, যে যার স্বার্থ, লাভ অনুযায়ী। এতে আমাদের, সাধারণ মানুষজনের ভয়, আতঙ্ক, অসহায়তা, দুশ্চিন্তা হওয়া ছাড়া আর কী হতে পারে বলো? অথচ, এই সময়ে যাঁদের সোচ্চার হয়ে বলার কথা ছিল, তাঁদের তেমন করে বলতে দেখছি না!
এ ছাড়াও বলি, কিছু কিছু মানসিক সমস্যা আছে, যা এই সময় হচ্ছে, হবার কথা, তা কারোর হলে সে নিজেই বা পরিবারের সাহায্যেই সমাধান করতে পারে, কিছু কিছু পাড়ার প্রতিবেশীদের সাহায্যে, সামাজিক সহায়তায়। এমন ভাবে কি সমাধানগুলোকে, বেরিয়ে আসার রাস্তাগুলোকে আলাদা করা যায়, নাকি অনেক কিছুকে মিশিয়ে দিতে হয়, দিতে হবে?

■ মোহিত : 'কোভিড ১৯' অসুখটা সম্পর্কে নানা মত থাকার একটা কারণ সম্ভবত এই যে এই ভাইরাস চরিত্রগত ভাবে একেবারে নতুন। শুধু তাই নয়, এই ভাইরাস প্রতিনিয়ত মিউটেশনের মাধ্যমে নিজেকে বদলেছে। ফলে এর প্রকৃতি সম্পর্কে এখনও অনেক অস্পষ্টতা রয়ে গেছে। অন্ধের হস্তী দর্শনের মতো হয়েছে বিষয়টা! আর, উদার অর্থনীতির দেশগুলোতে জনস্বাস্থ্য সম্পূর্ণ অবহেলিত হওয়ার ফলে রাষ্ট্র এবং এই উদার অর্থনীতির পৃষ্ঠপোষকেরা এক অদৃশ্য জোট বেঁধে এই অবহেলা, এই চূড়ান্ত ব্যর্থতাকে ঢাকতে চেয়েছে নানা তথ্যের কারসাজিতে এবং প্রকৃত তথ্যকে গোপন করে, মহামারী আর বিপর্যয় মোকাবিলা আইন দিয়ে, সর্বাত্মক 'লক ডাউন' করে।
এবার আমি চেষ্টা করি, আপনার বাকি প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজার।

কোভিড ১৯-এর সংক্রমণের সময়ে যে সমস্যাগুলো সাধারণভাবে চোখে পড়েছে, তার মধ্যে আমরা দেখেছি সংক্রমিত হওয়ার আশঙ্কা থেকে আতঙ্কে পৌঁছে যাওয়া, উদ্বেগ উৎকণ্ঠার নানা সমস্যা, 'লক ডাউন'-এ ঘরবন্দি হয়ে পড়ার কারণে মেজাজ খিটখিটে হয়ে যাওয়া--যার প্রভাব বাড়িতে থাকা অন্যদের সঙ্গে সম্পর্কের ওপরেও পড়েছে, মানসিক কারণে নানা শারীরিক উপসর্গ, বিষণ্নতা। এছাড়া ছোটদের মধ্যে অতিচঞ্চলতা-জেদের সমস্যা, স্কুল-কলেজের পড়ুয়াদের মধ্যে ঘুমের রুটিন আমূল বদলে যাওয়া, অতিমাত্রায় স্মার্ট ফোন বা কম্পিউটার-নির্ভরতা।

কোভিড সম্পর্কে উদ্বেগ উৎকণ্ঠা, ভয় আর আতঙ্ক কাটিয়ে উঠতে প্রথমত জরুরি মনে হয়, ভয় পাওয়ানো টিভির খবর কিংবা আলোচনা থেকে বা খবরের কাগজের

কিংবা ফেসবুক বা 'হোয়াটস্ অ্যাপ ইউনিভার্সিটি'-র প্রতিবেদন থেকে দূরে থাকা। কোভিড সংক্রমণ শুরুর পর্বে টেলিভিশনের পর্দায় বিখ্যাত ডাক্তারবাবুদের কথা আমরা যত শুনেছি, তত আমাদের আতঙ্ক বেড়েছে। আর তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে টেলিভিশন চ্যানেলের টিআরপি আর কর্পোরেট হাসপাতালের ব্যবসা। রোমহর্ষক ভূতের গল্প বা সিনেমার মতোই আতঙ্কেরও ভালো বাজার আছে একথা আমরা না-জানলেও, জানে কর্পোরেট কোম্পানী।

দ্বিতীয়ত, কোভিড সংক্রমণ যে মূলত নাক-মুখ আর কিছু ক্ষেত্রে চোখের মাধ্যমে হতে পারে এই সত্য মনে রাখা। আমাদের শরীরের ত্বক বা অন্য কোনো অংশ দিয়ে সংক্রমিত হওয়ার কোন তথ্য এখনও পর্যন্ত চোখে পড়েনি। সুতরাং, নাক আর মুখ ঢাকার জন্য একটা বা দুটো নির্ভরযোগ্য মাস্ক পড়াই যথেষ্ট। যে ভাইরাসের প্রবেশ দ্বার নাক-মুখ-চোখ, সেই ভাইরাসের সংক্রমণ আটকাতে প্লাস্টিকের বানানো পিপিই-র ব্যবহারের যৌক্তিকতা কতখানি, বিশেষ করে আমাদের মতো আবহাওয়ার দেশে কতটা আরামদায়ক— তা নিয়ে আজ না হলেও আগামী দিনে যুক্তিমনস্ক চিকিৎসকরাই প্রশ্ন তুলবেন, এই প্রত্যাশা রইল। সংক্রমণ রুখতে ঠিকমতো মাস্ক পরার পাশাপাশি জরুরি বাইরের কোনো জিনিসে হাত দেওয়ার পর বা চোখে-মুখে হাত দেওয়ার আগে বা খাওয়ার আগে অবশ্যই সাবান দিয়ে ভালো করে একটু সময় নিয়ে হাত ধোওয়া। সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার ব্যবস্থা না-থাকলে স্যানিটাইজার ব্যবহার করা যেতে পারে। বলে নেওয়া ভালো, কেমিক্যাল স্যানিটাইজার থেকে ফেনাযুক্ত সাবান বেশি নির্ভরযোগ্য। যদিও দেশের বহু জায়গায় ভালো করে হাত ধোয়ার মতো পর্যাপ্ত জলের সরবরাহ কতটা আছে, তাও সন্দেহের। কলকাতা মহানগরের যাদবপুর অঞ্চলেও এই সমস্যা চোখে পড়েছে। দূরের গ্রাম বা মফস্বলের কী পরিস্থিতি তা সেই অঞ্চলের মানুষই বলতে পারবেন।

তৃতীয়ত, কোভিড ১৯-এ আক্রান্ত হলে যে রোগ লক্ষণগুলো সাধারণত দেখা যায় :

- গলা খুসখুস/শুকনো কাশি
- গলা ব্যথা
- জ্বর
- শ্বাসকষ্ট, বিশেষত একটু হাঁটলেই হাঁফ ধরা (সেই মুহূর্তে হাসপাতালে ভর্তি করা জরুরি, যেখানে অক্সিজেন দেওয়ার ব্যবস্থা অন্তত রয়েছে)
- ডায়েরিয়া
- নাকে কোনো গন্ধ না-পাওয়া (এটা করোনা-সংক্রমণের উল্লেখযোগ্য লক্ষণ)

- জিভে কোনো স্বাদ না-পাওয়া বা অন্য রকম স্বাদ (এটাও করোনা-সংক্রমণের গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ)
- শারীরিক ক্লান্তি ও দুর্বলতা
- মাথা যন্ত্রণা/ শরীরে নানা জায়গায় ব্যথা।

...এই মুহূর্তে চারপাশের অনেকেই ওপরের এই শারীরিক সমস্যাগুলোর মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন, যা সাধারণ কোনো ভাইরাসের সংক্রমণের কারণেও হতে পারে, কিংবা করোনা ভাইরাস সংক্রমণের কারণেও হতে পারে! এই নিয়ে অনেকেই আতঙ্কিত হয়ে পড়ছেন। RT-PCR Test-এর মাধ্যমে বোঝা সম্ভব এই রোগলক্ষণ কোভিড ১৯-এর সংক্রমণের কারণে কিনা! কোনো কোনো ক্ষেত্রে Rapid Antigen Test-এর মাধ্যমেও বোঝা যায়, তবে এই টেস্ট বহু ক্ষেত্রেই কোভিড 'পজিটিভ' চিনতে পারে না। দশ জনের Rapid Antigen Test- হলে হয়তো এক বা দু'জন 'পজিটিভ' পাওয়া যাবে, বাকিদের মধ্যে 'পজিটিভ' থাকলেও থাকতে পারে, যা ওই টেস্ট-এ ধরা পড়ল না! তবু সরকার এই টেস্ট-এর প্রতিই বেশি আস্থা রাখছে, তাই সরকারী ব্যবস্থায় এই টেস্ট করাতেই বাধ্য হচ্ছেন মানুষ। এক্ষেত্রে অবিলম্বে পরিচিত চিকিৎসকের কিংবা স্থানীয় স্বাস্থ্য কেন্দ্রের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন।

রোগলক্ষণ গোপন না-করে যত দ্রুত চিকিৎসা শুরু করা যাবে, ততই যে কোনো ভাইরাসের সংক্রমণ থেকে সুস্থ হয়ে ওঠার সম্ভাবনা বাড়বে। তা করোনা ভাইরাস হলেও একই কথা প্রযোজ্য। চিকিৎসায় যত দেরি হবে, ততই জটিলতা বাড়ার আশঙ্কা থাকবে।

কোভিড-আক্রান্ত ব্যক্তির কাছের মানুষজন এবং বন্ধু, আত্মীয় ও প্রতিবেশীদের শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে এবং ব্যক্তিগত সুরক্ষা-সতর্কতা নিয়েই তাঁর পাশে দাঁড়ানো খুব জরুরি! বাড়ির লোকজনকে বাড়িতে থাকতে অনুরোধ করে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র পৌঁছে দিয়ে বা কিনে দিয়ে সাহায্য করা জরুরি। সামাজিক জীব হিসাবে এই দায়িত্ব আমরা এড়িয়ে যেতে পারি না! সমাজের মানুষ এইভাবে পাশে থাকলে, রোগলক্ষণ গোপন করার প্রবণতাও কমবে।

মনে রাখা জরুরি, ১০০ জন যদি করোনা সংক্রমণের শিকার হন, তাঁদের মধ্যে ৮০ জনের ক্ষেত্রে কোনো রোগ লক্ষণ থাকবে না। টেস্ট করলে তাঁদের করোনা পজিটিভ হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়! ২০ জনের মধ্যে এক বা একাধিক রোগলক্ষণ দেখা যেতে পারে। তাঁদের মধ্যে ১০ জন বাড়িতেই অল্প চিকিৎসায় কিংবা বিনা চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে উঠবেন। বাকি ১০ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করার প্রয়োজন হতে পারে। এই ১০ জনের মধ্যে ৫ জন মাঝারি মাত্রায় অসুস্থ হতে পারেন, কিন্তু চিকিৎসায় তাঁরা

সম্পূর্ণ সেরে উঠবেন। বাকি ৫ জনের পরিস্থিতি গুরুতর হতে পারে। তাঁদের মধ্যে ১ থেকে সর্বাধিক ৩ জনের মৃত্যুও হতে পারে। যদিও আমাদের দেশে এখনও পর্যন্ত আক্রান্তের শতকরা হিসাবের নিরিখে মৃত্যুর হার ১.৬ শতাংশের মধ্যে। মনে রাখবো আমরা, করোনা মানেই মৃত্যু নয়। সতর্কতা প্রয়োজন, কিন্তু আতঙ্ক নয়। কোমর্বিডিটি (অর্থাৎ ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখ, সিওপিডি বা ফুসফুসের অসুখ, ক্যান্সার, অতিরিক্ত স্থূলতা) থাকলেই যে মৃত্যু, তাও নয়। 'কোমর্বিডিটি' থাকা সত্ত্বেও করোনা আক্রান্ত বহু মানুষ সুস্থ হয়ে উঠছেন।

তবে 'কোভিড ১৯'-এর সংক্রমণে দু'টো বিষয়ে খেয়াল রাখা খুব জরুরি। প্রথমত, রোগ লক্ষণ দেখা দিলেই চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি একটুও দেরি না-করে। দেরির কারণে বিপদের আশঙ্কা থেকে যায়। দ্বিতীয়ত, শরীরে অক্সিজেন স্যাচুরেশন মাত্রা নিয়মিত পরীক্ষা করা জরুরি। অনেক সময় কোনো শ্বাসকষ্টের অনুভূতি না-থাকলেও কমে যেতে পারে অক্সিজেন স্যাচুরেশন মাত্রা বিপজ্জনক ভাবে। এই কারণে অল্প বয়সে কোনো 'কোমর্বিডিটি' না-থাকা সত্ত্বেও আমাদের রাজ্যেই মারা গেছেন বেশ কয়েকজন।

চতুর্থত, উদ্বেগ উৎকণ্ঠা কাটিয়ে উঠতে গভীর শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যায়াম খুব কার্যকরী। শিরদাঁড়া সোজা করে বসে, চেয়ার বা টুলে বসলেও অসুবিধা নেই, খুব ধীরে ধীরে গভীর শ্বাস নিয়ে একইভাবে ধীরে ধীরে ছাড়া। সকালে আর বিকালে মিনিট পাঁচেক করে যদি নিয়মিত এই শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যায়াম অভ্যাস করা যায়, উদ্বেগ উৎকণ্ঠার মাত্রা কমবে। এছাড়াও যখনই মনের মধ্যে অস্থিরতা বা টেনশন দেখা দেবে, তখনও এটা করলে চট্ জলদি একটু প্রশমন হতে পারে।

পঞ্চমত, উদ্বেগ উৎকণ্ঠার কারণগুলোকে যুক্তি দিয়ে নিজেরাও বিশ্লেষণের চেষ্টা করে দেখতে পারি আমরা। এক্ষেত্রে প্রয়োজনে ভরসা করা যায়, গুরুত্ব দিয়ে আমার অনুভূতিকে বোঝার চেষ্টা করবেন, এমন কারোর কাছে মন খুলে বললে পরে বা বলতে না-পারলে লিখে ফেলতে পারলেও কিছুটা স্বস্তি পাওয়া যায়। তবে এক্ষেত্রে পরিবারের এবং সমাজেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। পরিবারের মানুষজন এবং প্রতিবেশীরা যখন উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় আক্রান্ত আমাদের পাশে থাকার অঙ্গীকার করেন, সব রকম পরিস্থিতিতে সহযোগিতার আশ্বাস দেন, কোনো জ্ঞান না-দিয়ে একটু সহমর্মিতার সঙ্গে আমাদের মনের অনুভূতি বোঝার চেষ্টা করেন তখন আমরা অনেক স্বস্তি বোধ করি। যদি এসব করেও স্বস্তি না মেলে, তখন মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের সহায়তা নেওয়া যায়।

মানসিক কারণে অনেক সময় নানা রকম শারীরিক উপসর্গ দেখা দেয়, একথা

আমরা প্রথম দিকে আলোচনা করেছি। আমরা সকালে ঘুম ভেঙে ওঠার পর থেকে রাত অব্দি যতক্ষণ সজাগ থাকি, ততক্ষণ প্রতি মুহূর্তে কোনো না কোনো অনুভূতির মধ্য দিয়ে যাই। সেইসব অনুভূতির খুব অল্পই প্রকাশ করি আমরা। অপ্রকাশিত অনুভূতি আমাদের মনের মধ্যেই 'অবচেতন' নামের কোটরে জমতে থাকে। তারপর সেইসব অপ্রকাশিত, অবদমিত অনুভূতি কোনো এক সময় বিস্ফোরিত হয় অস্বাভাবিক মানসিক পরিস্থিতি কিংবা কোনো শারীরিক রোগ লক্ষণের মধ্য দিয়ে। এক্ষেত্রে মনের অনুভূতিগুলোকে চাপা না-দিয়ে আমরা যদি কারোর কাছে মন খুলে বলা, লেখা বা সৃজনমূলক কোনো কাজের মাধ্যমে নিয়মিত প্রকাশের অভ্যাস গড়ে তুলি, তাহলে তা আমাদের মনকে ভালো থাকতে সাহায্য করে।

এই কোভিড সংক্রমণের সময়ে, লক ডাউন-এর সময়ে মন খারাপ আর বিষণ্ণতার লক্ষণগুলোর কথা আমি আগেই বলেছি। কী করতে পারি এই মন খারাপ হলে, কিংবা বিষণ্ণতায় আক্রান্ত হলে?

প্রথমত, এটা আমরা বুঝে নিতে পারি, বিপর্যয়ের পরিস্থিতিতে এই অবস্থা স্বাভাবিক। শুধু আমিই নই, অনেকেই এই পরিস্থিতির শিকার। মনের এই অসুবিধাকে চিনতে ও জানতে পারলে এবং মেনে নিতে পারলে মনের অস্থিরতা কিছুটা আশাকরি কমবে। খুব কম মানুষের জীবনই নিটোল আনন্দময় হয়। আমাদের অস্তিত্বের সঙ্গে জড়িয়ে আছে সুখ আর দুঃখ, দুটোই। সুখের মতোই দুঃখও আমাদের জীবনের এক চরম বাস্তবতা। দুঃখকে সঙ্গে নিয়ে পথ চলার অভ্যাস রপ্ত করতে পারলে হয়তো আমাদের দুঃখবোধ কিছুটা কমে।

দ্বিতীয়ত, 'কোভিড ১৯' সংক্রমণের কারণে এই উদ্বেগ উৎকণ্ঠা, অনিশ্চয়তার পরিস্থিতি স্থায়ী নয়। এরও শেষ আছে। এই ভাইরাস যত ছড়িয়ে পড়বে, এর ধার ও ভার ততই কমবে। ইতিমধ্যেই আমরা দেখতে পাচ্ছি, মানুষের মনে 'কোভিড ১৯'-এর সংক্রমণ ঘিরে যে ভয় দানা বেঁধে ছিল প্রথম দিকে, তা আস্তে আস্তে কমতে শুরু করেছে। মানুষ এখন কিছুটা সহজ হতে পারছে। আগামী দিনে এর প্রকোপ কমবেই, এই সম্ভাবনা প্রবল।

তৃতীয়ত, মন খুলে বলা যায়— বাড়ির কারও কাছে কিংবা ফোন বা সোশ্যাল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে কোনও আত্মজন বা বন্ধুর কাছে মনের কথা বলা। তাতে জমে থাকা অনুভূতির তীব্রতা কিছুটা কমে, মনের ভার কিছুটা হালকা হয়। মন খুলে লিখতে পারলেও মনের ভার কমে।

চতুর্থত, যদি শরীর-মন সঙ্গ দেয়, চেষ্টা করতে পারি আমরা নিজের পছন্দসই কোনো কিছুর মধ্যে নিজেকে ব্যস্ত রাখতে। হতে পারে তা কোনো সৃজনশীল চর্চা,

যেমন-ছবি আঁকা, গান করা বা শোনা, কোনো মিউজিক ইন্সট্রুমেন্ট শেখা বা বাজানো, কিছু লেখা, ফটোগ্রাফি, ভিডিয়ো বানানো; খেলাধুলো; সিনেমা দেখা; পছন্দের বই পড়া; নতুন কোনো ভাষা শেখা; বিপন্ন মানুষের পাশে দাঁড়ানো; রাজনৈতিক কার্যকলাপ।

এই ধরনের পছন্দ মতো কিছুর মধ্যে থাকতে পারলে মন ভালো থাকার, জীবনের মানে খুঁজে পাওয়ার একটা সম্ভাবনা তৈরি হয়।

এই প্রসঙ্গে, মনে পড়ে গেল ভিক্টর ই ফ্র্যাঙ্কল-এর কথা। ফ্র্যাঙ্কল একজন মনোচিকিৎসক ও মনোবিদ ছিলেন। তিনি অস্ট্রিয়ার অধিবাসী ছিলেন। জার্মানিতে তখন হিটলারের নাৎসি দলের রাজত্ব। নাৎসি শাসনে অস্ট্রিয়ায় জার্মান জাতীয়তাবাদের চিহ্নিত শত্রু ইহুদিদের, ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠকদের, সমকামীদের, প্রতিবন্ধীদের, বয়স্ক ও অথর্ব মানুষদের ধরে ধরে চালান করা হয়েছিল নাৎসিদের বানানো কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে। ইহুদি পরিবারে জন্ম হওয়া ভিক্টর ফ্র্যাঙ্কল-এরও স্থান হয়েছিল একটি কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে। কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের বন্দিদের মধ্যে থেকেই এক এক জনকে বেছে বেছে চালান করা হতো গ্যাস চেম্বারে কিংবা দাঁড় করিয়ে গুলি করা হতো। সেই ক্যাম্প-এ যাওয়ার পর তিনি দেখলেন, কারোর মুখে বিশেষ কথা নেই, সবাই ম্রিয়মান, প্রত্যেকে যেন মৃত্যুর অপেক্ষায় দিন গুনছে! ফ্র্যাঙ্কল এই দুর্বিষহ পরিবেশকে কিছুটা হালকা করার উদ্দেশ্যে একটু মজা করে সহবন্দিদের হাসানোর চেষ্টা করলেন। খুব একটা সাড়া পেলেন না। এরপর তিনি নাৎসি অফিসারদের হাঁটাচলা-কথা বলা আর মুদ্রাদোষের নকল করে হাসাতে চাইলেন।

অল্প বয়সী বন্দীরা সাড়া দিতে শুরু করলো, হাসতে শুরু করলো। কেউ কেউ বলে উঠলো, 'আবার দেখাও, আবার' ! তার পর আবার হাসির ফোয়ারা! একজন প্রৌঢ় বন্দি উঠে গিয়ে ফ্র্যাঙ্কলের জামার কলার ধরে ঝাঁকিয়ে বললেন, মস্করা পেয়েছো তুমি এখানে? আমরা মৃত্যুর অপেক্ষায় দিন গুনছি, আর তুমি মস্করা করছো? ফ্র্যাঙ্কল কলার ছাড়িয়ে শান্ত ভাবে বলে উঠলেন, হ্যাঁ মস্করাই তো! একটাই তো জীবন আমাদের! জানি, যে কোনোদিন মরতে হবে! কিন্তু, যে ক'টা মুহূর্ত বাঁচবো, সেই ক'টা মুহূর্ত কেন ম্রিয়মাণ হয়ে বাঁচবো? কেন উদযাপন করবো না আমাদের এই একটা মাত্র জীবনের বেঁচে থাকা প্রতিটি মুহূর্ত?

এরপর সেই বন্দি আবাসে জীবন উদযাপিত হল অতীতের মধুর রোমন্থনে, গল্প-কবিতা-গানে, সৃষ্টির আনন্দে, সহমর্মিতার আবহে! দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সোভিয়েত বাহিনীর কাছে হারার পর নাৎসিরা আত্মগোপন করতে শুরু করে, অনেক বন্দি মৃত্যু বরণ করেন, অনেক বন্দির সঙ্গে মুক্তি পান ফ্র্যাঙ্কলও। বেরিয়ে আসার পর ফ্র্যাঙ্কল

লিখেছিলেন 'ম্যান সার্চ ফর মিনিং', জীবনের অর্থ খুঁজতে 'লোগো থেরাপি' নামে নতুন চিকিৎসা পদ্ধতির উদ্ভাবন করেছিলেন। যেখানে বলেছিলেন, আমাদের শরীর বিধ্বস্ত হতে পারে। বিপর্যস্ত হতে পারে আমাদের মন। কিন্তু, আমাদের স্পিরিট বা জীবনীশক্তি অটুট থাকতে পারে। সেই জীবনীশক্তিকে আমরা উজ্জীবিত করতে পারি আমাদের অতীতের সুন্দর অভিজ্ঞতাগুলোর কথা মনে করে, আমাদের আনন্দ দেয়—এমন কিছুর মধ্যে থেকে, আমাদের চারপাশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে উপলব্ধির মাধ্যমে, আমাদের সৃষ্টির আনন্দে।

'আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়া'-র যে দর্শন, তার মধ্যেও আমাদের জীবনের গভীরতর অর্থ হয়তো আমরা খুঁজে পেতে পারি।

পরিশেষে বলি, সমস্ত কিছুর পরেও মন খারাপের মাত্রা যদি তীব্র আকার নেয়, বিষণ্ণতা দেখা দেয়, সেই বিষণ্ণতা যখন মাঝারি থেকে গুরুতর হয়ে ওঠে তখন অনেক সময় মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞের পরামর্শ প্রয়োজন হতে পারে, হতে পারে কাউন্সেলিং-এর পাশাপাশি ওষুধের মাধ্যমে চিকিৎসার প্রয়োজনও।

▪ **শুভেন্দু** : আমরা অনেকেই অনেক সংগঠনের সঙ্গে রয়েছি, যেমন তুমি আমি রয়েছি, গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, যাকে সবাই এ. পি. ডি. আর. নামে চেনে, তার সঙ্গে। এমন সংগঠনের কি কোনো ভূমিকা থাকতে পারে মানুষজনের মনকে ভালো রাখার?

এই প্রশ্নটাকে একটু বড়ো করলে, আমরা তো সবাই সামাজিক, একটা সমাজে মিলে মিশে, একে অপরের সঙ্গে থাকি। এই যে এখন আমাদের ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে একা একা করে দেওয়া হচ্ছে, হলো, তাতে কি সামাজিক সংগঠনগুলোর দায় আরও বেড়ে যায় না? বোঝানো দরকার, তুমি একা নও। আমরা পাশে আছি, তাই না? এটা কি মন ভালো রাখার উপায় হতে পারে? কীভাবে?

▪ **মোহিত** : খুব জরুরি কথা বললেন, শুভেন্দু দা! বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা 'সোশ্যাল ডিস্টেনসিং' শব্দবন্ধের ওপর জোর দিয়েছে। পাশ্চাত্যে মানুষ বুঝেছে 'সোশ্যাল ডিস্টেনসিং' মানে বাড়ির বাইরের কোনো মানুষের সঙ্গে কথা বলার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে কথা বলা। আর, আমাদের এখানে তার অর্থ দাঁড়িয়েছে অন্যদের সঙ্গে মেলামেশাই বন্ধ করে দেওয়া! সরকারও এমন আচরণ করেছে, তাতে দ্বিতীয় ধারণাটিই জোরালো হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে আমরা সংক্রমণের আশঙ্কা কমাতে মাস্ক পড়ার সঙ্গে নির্দিষ্ট শারীরিক দূরত্ব রেখে অন্যদের সঙ্গে কথা বলার কথা বলছি। জোর দিচ্ছি, সামাজিক মেলবন্ধন আরও বাড়ানোর ওপর।

এই 'কোভিড ১৯' আর 'লক ডাউন' আমাদের কাছে সুযোগ এনে দিয়েছে বিপন্ন মানুষের কাছে যাবার, তাঁদের পাশে দাঁড়ানোর। বহু সামাজিক সংগঠন, ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন সংগঠন, সমাজমনস্ক বহু ব্যক্তি মানুষ এই উদ্যোগ অনেক আগেই শুরু করেছেন।

আমার জানা প্রথম যে উদ্যোগ গড়ে উঠেছিল এ-রাজ্যে 'কোভিড ১৯'-এর সংক্রমণ শুরুর সময়, তার উদ্যোক্তা ছিলেন 'সমীক্ষণী'-র সঙ্গে যুক্ত বুলবুল বক্সী। সেই উদ্যোগ ছিল মুলত অ্যাডভোকেসি-র উদ্দেশ্যে গড়ে ওঠা, 'কোভিড ১৯ সিটিজেন্স অ্যাডভোকেসি গ্রুপ'। বেশ কয়েকজন সমাজমনস্ক মানুষ সেই গ্রুপে যুক্ত হয়েছিলেন। বেশ কিছু উদ্যোগও নেওয়া হয়েছিল। এই 'লক ডাউন' পর্বে হুগলী জেলার শ্রীরামপুরে থাকার সুবাদে হুগলী জেলায় বেশ কিছু উদ্যোগ কাছ থেকে জানার সুযোগ হয়েছে। আমার জানা বহু উদ্যোগের মধ্যে শ্রীরামপুর নাগরিক উদ্যোগ, আমরা-এক সচেতন প্রয়াস, ছাত্রছাত্রীদের বহু সংগঠন, নাগরিক সমাজের বহু উদ্যোগের পাশাপাশি এপিডিআর-এর সঙ্গে যুক্ত বহু মানুষ এপিডিআর কিংবা অন্য কোনো নাগরিক উদ্যোগের পক্ষে বিপন্ন মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন।

এপিডিআর, শ্রীরামপুর শাখা লিখিতভাবে রিষড়া মিউনিসিপ্যালিটির কাছে কোভিড সহায়তার রূপরেখা তৈরি করে দিয়েছে। এপিডিআর-এর বিভিন্ন শাখার উদ্যোগে বহু জায়গায় পথসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত অনেকেই কোভিড-সংস্পর্শের কারণে অচ্ছুত হওয়া, সামাজিক হেনস্থার শিকার হওয়া মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন, করোনা-আক্রান্ত পরিবারে পৌঁছে দিয়েছেন প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র আর ওষুধ। কোন্নগরের 'তরুণ দল'-এর বন্ধুরা গত তিন মাস ধরে বহু বিপন্ন মানুষকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। কোভিড-আক্রান্ত এবং অন্য কোনো অসুস্থতার মধ্যে থাকা মানুষকে পৌঁছে দিয়েছেন হাসপাতালে, বাড়িতে পৌঁছে দিয়েছেন প্রয়োজনীয় সামগ্রী। 'চুঁচুড়া আরোগ্য' নামের একটি সংগঠন, যাঁরা বহুদিন ধরেই মানুষকে চিকিৎসা সহায়তা দিয়ে থাকেন, তাঁরাও এই সময়ে নানাভাবে সাহায্য করেছেন আক্রান্ত মানুষকে।

গত ১ জুলাই কলকাতার বেশ কয়েকজন চিকিৎসক, মেডিকেল ছাত্র, কোভিড-জয়ী এবং সমাজমনস্ক-সংবেদনশীল মানুষের উদ্যোগে গড়ে উঠেছে কোভিড কেয়ার নেটওয়ার্ক। কলকাতাসহ বিভিন্ন জেলায় গড়ে উঠছে কোভিড কেয়ার নেটওয়ার্ক-এর আঞ্চলিক সমন্বয়। হুগলী জেলাতেও প্রায় সমস্ত বড় শহরেই ছড়িয়ে পড়েছে কোভিড কেয়ার নেটওয়ার্ক-এর সমন্বয়।

■ **শুভেন্দু** : এই কোভিড কেয়ার নেটওয়ার্ক কীভাবে কাজ করছে, কী সাহায্য এদের কাছে মানুষ পেতে পারে?

▪ **মোহিত** : কোভিড কেয়ার নেটওয়ার্ক আসলে বহু চিকিৎসক, মেডিকেল কলেজের শিক্ষক- ছাত্রছাত্রী, কোভিড-জয়ী, অসংখ্য সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন আর সংবেদনশীল মানুষের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা একটি উদ্যোগ।

কোভিড কেয়ার নেটওয়ার্ক'-এর মূল কাজগুলো হলো—

- 'কোভিড ১৯' সম্পর্কে অমূলক আতঙ্ক, উদ্বেগ উৎকণ্ঠা দূর করে বিজ্ঞানসম্মত সতর্কতা সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তোলা।
- করোনা সংক্রমণে আক্রান্ত মানুষ, তাঁদের পরিবার এবং করোনা সংক্রমণের বিরুদ্ধে সামনে থেকে যাঁরা যুদ্ধ করছেন সেই ডাক্তার, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী, অ্যাম্বুলেন্স-চালক, প্রশাসনিক আধিকারিক ও কর্মী, সাফাইকর্মী, পরিষেবা কর্মীদের সামাজিক হেনস্থার হাত থেকে বাঁচানো, তাঁদের পাশে দাঁড়ানো, সমাজে সহমর্মিতার পরিবেশ গড়ে তুলতে উদ্যোগ নেওয়া।
- বাড়িতে কারোর একটু জ্বর, সর্দি, কাশি হলেই মনের মধ্যে দেখা দিচ্ছে আশঙ্কার মেঘ। যদি করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ হয়, সেই আশঙ্কায় নানা দুশ্চিন্তা ভীড় করছে মনে। কেমন করে বুঝবো, করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ কি না? সংক্রমণ হলে কীভাবে টেস্ট করাবো? কোথায় টেস্ট সম্ভব? চিকিৎসার সুযোগ কোথায় পাবো? অ্যাম্বুলেন্স পাবো তো? বেড আছে কিনা কীভাবে জানবো? কত খরচ হবে? চিকিৎসায় আদৌ সেরে উঠবো তো? করোনা হয়েছে জানলে আশপাশের মানুষ কী আচরণ করবে? একঘরে, অস্পৃশ্য করে দেবে না তো? ঘরে থাকতে বা ঢুকতে দেবে তো? ঝামেলা করবে না তো?

— করোনা-আক্রান্ত মানুষ এবং তাঁদের পরিবারের অনেককেই এই সব দুর্ভাবনার মধ্যে দিয়ে যেতে হচ্ছে।

এই পরিস্থিতিতে কোভিড কেয়ার নেটওয়ার্ক :

- কোভিড-এর লক্ষণে আক্রান্ত মানুষের পাশে দাঁড়াতে,
- হসপিটালে ভর্তি হতে এবং অ্যাম্বুলেন্স পেতে সাহায্য করতে,
- তাঁদের চিকিৎসা-সহায়তা করতে, প্রয়োজনে অক্সিমিটারে তাঁদের অক্সিজেন স্যাচুরেশন মাত্রা দেখে আসতে, হোম আইসোলেশনে/কোয়্যারান্টাইনে থাকা কোভিড আক্রান্ত ব্যক্তির ওষুধপত্র এবং দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনে পৌঁছে দিতে 'কোভিড কেয়ার নেটওয়ার্ক'-এর স্বেচ্ছাসেবী বন্ধুরা সাধ্যমতো পাশে থাকতে উদ্যোগী হয়েছেন।
- করোনা সংক্রমণের কারণে খুব অল্প সংখ্যায় হলেও কিছু মানুষ গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁদের চিকিৎসায় কোভিডের অ্যান্টিবডি রয়েছে এমন প্লাজমার

ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। কোভিড কেয়ার নেটওয়ার্ক 'কোভিড-জয়ী' মানুষদের প্লাজমা দান করে গুরুতর অসুস্থ মানুষদের বাঁচাতে উৎসাহ দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে।

কোভিড কেয়ার নেটওয়ার্ক-এর মতোই আর একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ কাজ করে চলেছে এই সময় 'জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা সমন্বয়' নামে। এই সমন্বয়ের পক্ষ থেকেও কোভিড আক্রান্ত মানুষকে বিভিন্ন ভাবে সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। 'জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা সমন্বয়'-এর প্রস্তাবনায় লেখা হয়েছে :

'মহামারী দোরগোড়ায় এসে উঠেছে। চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের স্বার্থহীন আত্মত্যাগের পরও বিনা চিকিৎসায় মরতে হচ্ছে হাজার হাজার মানুষকে। সরকারের সাথে মানুষের যোগাযোগ সূত্র স্থাপন করা সম্ভব হচ্ছে না। স্থানীয় স্তরে আক্রান্ত মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসগুলির যোগান দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। সঙ্গে থাকছে গাফিলতি। কাজেই, সমাজের একদল মানুষের এগিয়ে আসা প্রয়োজন নিজের ও নিজের পরিবারের পাশাপাশি এই মানুষগুলোর স্বার্থে। আমাদের কাজ হবে রোগীর সমস্ত প্রয়োজন মিটছে কিনা তা দেখা, স্থানীয় স্তরে স্বাস্থ্যকর্মী ও চিকিৎসকদের কাজকে সহজ করা যায় কিনা তার চেষ্টা করা, রক্ত ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর যোগান দেওয়া এবং বিভিন্ন গণমাধ্যমকে ব্যবহার করে সরকারের সাথে নাগরিকের একটি স্বাস্থ্য সম্পর্কিত যোগাযোগ মাধ্যম নির্মাণ করা। মহামারীর বিরুদ্ধে এই লড়াইয়ে আমাদের মূল মন্ত্র হবে--আসল অস্ত্র সমন্বয়।'

এই সময়ে খুব কাছ থেকে দেখলাম, বহু মানুষ— যাঁরা এই কোভিড সংক্রমণের আশঙ্কা আর দীর্ঘমেয়াদি 'লক ডাউন'-এ একেবারে হতোদ্যম হয়ে পড়েছিলেন, তাঁরা কী উদ্যমে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন বিপন্ন মানুষের পাশে দাঁড়াতে, নানাভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে! যে যার মতো করে কখনো ব্যক্তি উদ্যোগে, কখনো কোনো সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে চেষ্টা করে চলেছেন জীবনের অন্যতর এক অর্থ খোঁজার।

▪ **শুভেন্দু** : মনের সমস্যার একটা বড়ো দিক হচ্ছে অর্থনীতি, যেটা নিয়ে খুব একটা কথাবার্তা হচ্ছে না, হওয়া দরকার। কাজ নেই, আয় নেই, কেনা বেচা নেই, আজ থাকলেও, কাল থাকবে কিনা জানি না! সরকার, চাকরি সংস্থা, বাজার, অর্থনীতি যারা জানে, বোঝে, তারা কেউই আমাকে কিছু বলছে না! সরকার আমার টাকাপয়সার সমস্যার পাশে থাকছে না! এর থেকে দুশ্চিন্তা, মানসিক সমস্যা হওয়া তো স্বাভাবিক, তাই না?

আর, এমন সমস্যার কী সমাধান হবে, যদি আমরা এই বৈষম্যে ভরা ব্যবস্থাকে প্রশ্ন করতে না পারি? তার দিকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিতে না পারি? কিংবা, একসঙ্গে বাঁচার সমাজ বানাতে না পারি? আমি খেতে পারলে তুমিও পাবে, এমন কথা না বলতে পারি? এমন কাজ করে দেখাতে না পারি?

তোমার কী মনে হয়, আমরা সবাই এখন এমন একটা অবস্থায় চলে এসেছি, যেখানে আমারটা আমি বুঝে নেবো। তোমার কী হলো, হবে, আমার দেখার দরকার নেই। ব্যক্তি মানুষের যেমন 'মন' থাকে, সমাজেরও তেমনি 'মন' হয়। তোমরা যারা এই বিষয়টাকে নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করো, কাজ করো, তারা এই বিষয়টা নিয়ে, 'সমাজ-মনের' সমস্যা নিয়ে কী ভাবো, ভাবছো, যদি বলো?

▪ **মোহিত** : শুভেন্দু দা, আমি অর্থনীতি সম্পর্কে বলার ধৃষ্টতা দেখাতে পারি না। তবে তৃণমূল স্তরের একজন মানসিক স্বাস্থ্য কর্মী হিসাবে, গণতান্ত্রিক ও মানবাধিকার আন্দোলনের একজন কর্মী হিসাবে যতটুকু বুঝি তার ভিত্তিতেই কিছু কথা বলতে ইচ্ছে করছে।

আমি প্রথম দিকেই বলেছিলাম, মন বলতে শুধু আমার ভিতরের উপাদানগুলোকে বুঝি না, শুধু নিউরোট্রান্সমিটার-এর ভারসাম্যের খেলাকে বুঝি না, সেই অভ্যন্তর এবং শরীরের বাইরের জগতের প্রতিনিয়ত আদান প্রদানকে বুঝি।

বাইরের জগৎ বলতে আমার চারপাশের বস্তু জগৎ, পরিবেশ-প্রকৃতি, মানুষ-মানুষের আচরণ, সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল, সমাজের নিয়ম-নীতি, বেঁচে থাকার উপাদানগুলো, সরকার-সরকারের নীতি, অবশ্যই আমাদের যাপন যে ভিত্তির ওপর অনেকখানি দাঁড়িয়ে—সেই অর্থনীতি এবং প্রতিদিনের নানা ঘটনাপ্রবাহ। এই সব কিছুই আমার বাইরের জগতের উপাদান। এই ভিতর আর বাহিরের আদানপ্রদান যদি প্রতিনিয়ত চলতে থাকে, তার প্রভাব আমাদের মনের ওপর পড়বেই, এবং পড়ছেও।

এটা একেবারেই আপনার বিষয়, শুভেন্দু দা! তবু সাহস করে বলি, আমরা দেশের জিডিপি বৃদ্ধির হার কতটা বাড়ল শুধুমাত্র সেই তথ্যের ওপর নির্ভর করে দেশের অর্থনীতি বুঝতে চাই না, যদিও বর্তমানে আমাদের দেশে জিডিপি বৃদ্ধির হার সম্ভবত গত তিরিশ বছরের নিরিখে সর্বনিম্নে। আমার মনে হয়, একটা দেশের অর্থনৈতিক সার্বিক উন্নতি ফুটে ওঠে সেই দেশের মানবসম্পদ উন্নয়নের কী পরিস্থিতি তার ওপর। অর্থাৎ, সেই দেশের মানুষের জন্য পুষ্টির যোগান কতটা রয়েছে; শিশু মৃত্যুর হার কী রকম; সামগ্রিকভাবে দেশের মানুষের সাধারণ স্বাস্থ্যের কী অবস্থা—স্বাস্থ্য বলতে অবশ্যই আমরা বুঝবো, 'শারীরিক-মানসিক-সামাজিক স্বাস্থ্য'; সামাজিক সাম্য কতটা রয়েছে—লিঙ্গ, ধর্মীয়, জাতপাত ভিত্তিক, ভাষা ভিত্তিক... এই সবের মধ্যে দিয়েই মানবসম্পদ উন্নয়নের ছবি ফুটে ওঠে।

আমি শুধু দু' তিনটে তথ্যই তুলে ধরবো এখানে। পৃথিবীর পঁচিশ শতাংশ ক্ষুধার্ত মানুষের বসবাস আমাদের ভারতে। উন্নত দেশগুলোর কথা ছেড়ে দিলাম, 'মেরা ভারত মহান'-এর এই দেশটি অপুষ্টির নিরিখে আমাদের নিকটতম 'পিছিয়ে-পড়া দেশ' পাকিস্তান, বাংলাদেশ, নেপালের থেকেও পিছিয়ে। দেশের মাত্র ১ শতাংশ পরিবারের হাতে ৪২. ৫ শতাংশ সম্পদ কুক্ষিগত রয়েছে। এই হিসেব এ বছরের জানুয়ারি মাসে প্রকাশিত। এর পর এই লক ডাউনের সময়ে দেশের সাতখানা বিমানবন্দর আদানি গোষ্ঠীর হাতে তুলে দিল বর্তমান 'দেশপ্রেমিক' কেন্দ্রীয় সরকার। ব্যক্তি মালিকানাধীন কয়লাখনি, ব্যাঙ্ক... যা সত্তরের দশকে সরকার জাতীয়করণ করেছিল, এখন সেগুলোর নিলামের পথ খুলে দেওয়া হলো পছন্দের শিল্পগোষ্ঠীর স্বার্থে। এই 'লক ডাউন'-এর মধ্যেই সাত-সাতখানা বিমান বন্দর অতিপছন্দের শিল্পগোষ্ঠী আদানিদের হাতে তুলে দেওয়া হলো। রেল ব্যবস্থাও পছন্দের শিল্পগোষ্ঠীর হাতে হয়তো খুব শীঘ্রই তুলে দেওয়া হবে। সুতরাং, আগামী দিনে বৈষম্য কমার কোনো লক্ষণ নেই, বরং ওই ১ শতাংশের উদর আরও ভরবে, দেশ আরও নিচে নামবে, গরীব মানুষ আরও গরীব হবে। আর, গরীব মানুষের অবস্থা যত খারাপ 'দেশপ্রেম' আর 'ধর্মপ্রেম' ততই বাড়বে।

অভিজ্ঞতায় দেখেছি, দারিদ্র্য আর মানিসক অসুস্থতা হাত ধরাধরি করে চলে। আমরা কলকাতায় ১৯৯৮-৯৯ সালে মন ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে মাধ্যমিক পর্যায়ের স্কুলগুলোতে একটি সমীক্ষা করেছিলাম, সেখানে আমরা প্রায় ২৩.৮ শতাংশ স্কুল পড়ুয়ার মধ্যে কোনো না কোনো মনের সমস্যা দেখতে পেয়েছিলাম। এদের মধ্যে বড়ো অংশটাই ছিল অর্থনৈতিক ভাবে খুব পিছিয়ে পড়া পরিবার থেকে আসা ছাত্রছাত্রী।

দারিদ্র্য নিজেই মানসিক অসুস্থতার ক্ষেত্রে বড়ো ভুমিকা নিয়ে থাকে। দারিদ্র্যের সঙ্গে থাকে বৈষম্য, নির্যাতন, কর্মহীনতা, রোজগারের নিরাপত্তা না-থাকা, আর্থিক অনটন-অনিশ্চয়তা, নিরাপত্তার অভাব, খিদে, বাসস্থানের সমস্যা, শিক্ষার সমস্যা, সচেতনতার সমস্যা, স্বাস্থ্যের সমস্যা, মাদক-নির্ভরতা, আত্মসম্মানের সঙ্গে বাঁচার অনিশ্চয়তা...আরও অনেক কিছুই যা আমাদের মনকে, মনের স্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করতে থাকে নানাভাবে।

কোভিড-পর্বে, বিভিন্ন পর্যায়ে দীর্ঘমেয়াদি 'লক ডাউন' দিন-আনা-খাওয়া মানুষের বেঁচে থাকাকে দুর্বিষহ করে তুলেছে! অভুক্ত থেকেছেন তাঁরা দিনের পর দিন। সরকারি রেশন ব্যবস্থা, পুরসভা, পঞ্চায়েত ওই পর্বে একেবারে ম্যাজিকের মতো উধাও হয়ে গেল! অভুক্ত মানুষকে খাবারের জন্য অপেক্ষায় থাকতে হলো 'বনের

মোষ তাড়ানো' স্বেচ্ছাসেবী ত্রাণকর্মীদের কিংবা পুলিশের। সমগ্র প্রশাসন হয়ে পড়ল পুলিশ-নির্ভর। এতে পুলিশের ওপরেও বাড়ল মানসিক চাপ, সেই চাপের প্রকাশ অনেক সময় আমরা দেখতে পেলাম নিয়ম-ভাঙা পথচারীদের ওপর পুলিশের আচরণে।

এই পরিস্থিতি থেকে বেরোতে হলে সব মানুষের আত্মমর্যাদার সঙ্গে বাঁচার জন্য সমস্ত অধিকারগুলো সম্পর্কে সজাগ হওয়ার উদ্যোগ আমাদের নিতে হবে, প্রশ্ন তুলতে হবে এই নিদারুণ বৈষম্য নিয়ে। শিল্পগোষ্ঠীর এই বিপুল সম্পদের মূলে তাদের 'পরিশ্রম' কিংবা 'দূরদর্শীতা'-র ভূমিকা যতখানি, তার থেকে অনেক বড় ভূমিকা থাকে রাজনৈতিক মদতে দুর্নীতি, স্বজনপোষণ, আর লাগামহীন শোষণের। রাজনৈতিক দলগুলোর মদতেই তা চলে। মুষ্টিমেয় কয়েকজন শিল্পপতি আর ব্যবসায়ীর স্বার্থেই বদলে গেল এই 'লক ডাউন'-এর সময়েই একের পর এক আইনকানুন। রাজনৈতিক দলগুলোর এই প্রবঞ্চনার ভূমিকা তথ্য দিয়ে মানুষের কাছে তুলে ধরা জরুরি। প্রতিটি রাজনৈতিক দলের ফান্ডকেও তথ্যের অধিকার আইনের আওতায় নিয়ে আসার দাবি উঠুক। ইলেকশনের আগে কাদের কাছ থেকে অর্থ পাচ্ছে তারা, কীসের বিনিময়ে বা কোন্ শর্তে পাচ্ছে—তা প্রকাশ্যে আসুক। প্রকাশ্যে আসুক, কোন্ ম্যাজিকে রাজনৈতিক দলের নেতানেত্রীর এবং আমলাদের একাংশের গুণিতক হারে সম্পদ বৃদ্ধি পায়! একদল মুষ্টিমেয় মানুষ অশ্লীল বৈভবের প্রদর্শনীতে মাতবে, আর দেশের বিপুল সংখ্যক মানুষ চূড়ান্ত দারিদ্র্যে বাঁচবে, এই পরম্পরা যদি আমরা মেনে নিতে থাকি, আগামী দিনে মানুষের বেঁচে থাকার সব উপকরণগুলোই হস্তগত হবে মুষ্টিমেয় শ্রেণির হাতে। নিঃস্ব মানুষের তালিকায় নাম জুড়বে আজ যারা মধ্যবিত্ত তাদের বৃহত্তম অংশেরই।

আমাদের মধ্যে স্বার্থপরতা নতুন কিছু নয়! বরাবরই তা ছিল। তার সঙ্গে পরার্থপরতাও ছিল। ছিল, অন্যের বিপদে-আপদে পাশে দাঁড়ানো, সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া। এমনকি কখনো কখনো নিজের বিপদের ঝুঁকি সত্ত্বেও অন্যের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়াও ছিল আমাদের ঐতিহ্য। সাম্প্রতিককালে সেই সামাজিক যৌথতা, অন্যের পাশে দাঁড়ানোর প্রবণতা চোখে পড়ার মতো কমতে শুরু করলো! 'কৃতি সংবর্ধনা পাওয়া' গোপাল আরও সাফল্যের লক্ষ্যে ক্রমশ আরও আত্মকেন্দ্রিক হয়ে উঠলো, আর 'ডানপিটে'-'বখে যাওয়া' রাখালদের বাবা-মাও ধরে-বেঁধে তাদের 'গোপাল' করে তুলতে উঠে পড়ে লাগলেন!

মূলত নম্বর-কেন্দ্রিক, আত্মমুখী শিক্ষা যে সত্যিকারের মানবিক বোধ সম্পন্ন হয়ে ওঠার, জনস্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠার, অন্যের প্রতি সহানুভূতি-প্রবণ হয়ে ওঠার শিক্ষা দিতে অপারগ, তা এই ঘটনাগুলোর মধ্যে দিয়ে আরও স্পষ্ট হয়ে উঠলো।

অন্যদিকে এক ধরনের রাজনৈতিক মতাদর্শও আমাদের মধ্যে এই আত্মকেন্দ্রিকতার প্রবণতাকে বাড়িয়ে চলেছে। শুধু ভারতে নয়, গোটা বিশ্ব জুড়েই এক অদ্ভুত ধারণা চারিয়ে দেওয়া হচ্ছে, তা হলো, আমি খারাপ আছি বা আমার যা কিছু খারাপ হচ্ছে তার জন্য দায়ী অন্যরা—যারা ঠিক আমার মতো নয়, ভিন্ন ধর্ম/ ভিন্ন ভাষা/ ভিন্ন জাতি/ ভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ। এই 'ভিন্ন' কিংবা 'বহিরাগত'-র ধারণা কখনও ভাষা, কখনও জাতি, কখনও ধর্মকে ঘিরে আবর্তিত হয়ে চলেছে। বার বার মনে করানো হয়েছে এবং হচ্ছে, আমার যেগুলো পাওয়ার কথা ছিল সেগুলো পাচ্ছি না, যার মূল কারণটাই হলো এই 'বহিরাগত' কিংবা 'ভিন্ন'-দের উপস্থিতি। এই ধারণা নতুন কিছু নয়, আমরা অতীতে দেখেছি, জার্মানিতে হিটলারের মতো একনায়কের উদ্ভবও এই ধারণাকে ভিত্তি করেই হয়েছিল। এই ধারণা বর্তমানেও অত্যন্ত সচেতনভাবে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। আমাদের দেশের বর্তমান শাসক দলও হিটলারের নাৎসি পার্টির সিলেবাস দাঁড়ি, কমা, সেমিকলনসহ হুবহু অনুসরণ করে চলেছে। জার্মানিতে 'শত্রু' চিহ্নিত করা হয়েছিল ইহুদিদের, কমিউনিস্টদের। আর, আমাদের দেশে 'শত্রু' চিহ্নিত করা হলো, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ, দলিত এবং প্রতিস্পর্ধী গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষে দাঁড়ানো মানুষদের।

এই আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থপরতা ও হিংস্রতার চাষাবাদে হয়তো আমাদের এই শিক্ষা ব্যবস্থা আর বর্তমান বিদ্বেষ আর ঘৃণার রাজনীতির অবদান অনেকখানি।

■ **শুভেন্দু** : একটা না-জানা, না-বোঝার পরিবেশ থেকে এক ধরনের 'সামাজিক হিংসা' তৈরি হচ্ছে, পাড়ার কারোর এই অসুখটা হয়েছে শুনলে বাকিরা হিংস্র হয়ে উঠছে। একঘরে করে দিচ্ছে, পাড়া থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছে, মারধোর করছে।

অথচ তুমি জানো আমাদের যৌবনে পাড়ার কোনো বাড়িতে কলেরা, বসন্ত বা অন্য কোনও অসুখে, 'ছোঁয়াচে' বলে দাগ দিয়ে দেওয়া অসুখেও পাড়ার লোকেরা পাশে থেকেছে, দরকারে ডাক্তার ডেকে এনেছে, হাসপাতালে নিয়ে গেছে, হাসপাতালে রাত জেগেছে। আমরাই করেছি। তো এই অসুখটা এমন কি আলাদা যে পাড়ার লোকেরা অন্যরকম ব্যবহার করছে? নাকি, পাড়াই বদলে গেছে? যদি তাই হয়, তাহলে তো সেটা পাড়ার, সমাজের 'মানসিক অসুখ', তাই না? সমাজের এই 'অসুখ' সারানোর উপায় কী?

■ **মোহিত** : আপনি ঠিকই বলেছেন, শুভেন্দু দা। এই কোভিড সংক্রমণের পর্বে আমাদের অনেক চেনা-পরিচিত মানুষকেও বদলে যেতে দেখলাম। তাঁদের মধ্যে করোনা-সংক্রমিত মানুষকে, তাঁদের পরিবারের মানুষজনকে, চিকিৎসা এবং অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় পরিষেবা দিতে থাকা মানুষকে 'অস্পৃশ্য' হিসাবে দাগিয়ে দিতে দেখলাম। অনেকের আচরণে ফুটে উঠল অপ্রত্যাশিত হিংস্রতা।

করোনা সংক্রমণ শুরু হওয়ার পর্বে উত্তরবঙ্গ থেকে ফোন করেছিলেন এক বন্ধু, যিনি চা বাগানের শ্রমিকদের মধ্যে শিক্ষা-স্বাস্থ্য নিয়ে কর্মরত একটি অসরকারি সংস্থার কর্ণধার। সদ্য শুরু হওয়া কোভিড-পর্বে তিনি আক্রান্ত হয়েছিলেন তীব্র উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ও আতঙ্কে। মৃত্যুভয় ততটা নয়, যতটা সামাজিক হেনস্থা ও বিচ্ছিন্নতার আশঙ্কা। সেই আশঙ্কার রেশ এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেননি সেই বন্ধু।

সেই আশঙ্কাকে সত্যি প্রমাণ করেছিল কলকাতা মহানগরী। তার দিন কয়েক পরেই খবরের কাগজে আমরা দেখেছিলাম, 'হাসপাতাল-ফেরত বৃদ্ধকে করোনা-রোগী সন্দেহে মার'। সত্তরোর্ধ নারায়ণ চৌরাশিয়া দীর্ঘদিনের লিভারের অসুখে আক্রান্ত। আর.জি.কর. মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে ফিরছিলেন, শেষে ক্লান্ত হয়ে মাঝ রাস্তায় বসে পড়েন তিনি, দু'হাতেই স্যালাইনের চ্যানেল, মাথায় সার্জিক্যাল ক্যাপ, মুখে মাস্ক। 'নির্ঘাত করোনা রোগী, পালিয়ে এসেছে হসপিটাল থেকে', ঝাঁপিয়ে পড়লো লোকজন, 'করোনা হয়নি আমার' বলা সত্ত্বেও জুটল মারধোর, মাথায় ক্ষত আর দু'হাতে চোট নিয়ে কোনো রকমে বাড়ি ফিরেছিলেন তিনি। সংক্রমণ শুরু হওয়ার একেবারে প্রথম দিকের ঘটনা, এক আমলা-পুত্রের বিদেশ থেকে করোনা-সংক্রমণ নিয়ে ফেরার পর, সমস্ত বৃত্তান্ত জানা-বোঝার আগেই যেভাবে আমরা খবরের কাগজ-টেলিভিশন-সোশ্যাল মিডিয়ায় ঝাঁপিয়ে পড়লাম সেই যুবক এবং তার পরিবারের ওপর, তা 'মব লিঞ্চিং' থেকে কোনো অংশে কম নয়! বিদেশ থেকে যেই ফিরছে, তাঁদের ছবি দিয়ে, নাম দিয়ে শুরু হয়ে যাচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচার! যদি মেনেও নিই, এই ব্যক্তিরা কেউ কেউ দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণ করেছেন! তাহলেও আমরা যা করলাম, তা কি যুক্তিগ্রাহ্য হয়ে যায়!

আমার এক সাংবাদিক বন্ধুর বিশেষ পরিচিত এক বিদেশী নাগরিককে তাঁর ভাড়া বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া হলো শুধুমাত্র তিনি শ্বেতাঙ্গ বলে। একই অভিজ্ঞতা হলো এই কলকাতা মহানগরেই বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত চিকিৎসক ও নার্সদের। 'বাড়িওয়ালা বাড়িতে ঢুকতে দিচ্ছেন না'—এই অসহায়তার মুখোমুখি হলেন অনেকেই। তাঁদের অপরাধ, তাঁরা চিকিৎসা-পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত! তার মানে তাঁদের করোনা-রোগী দেখতে হচ্ছে, তার মানে তাঁরা করোনার ভাইরাস বয়ে বেড়াচ্ছেন, তার মানে এতে আমরা সবাই সংক্রমণের শিকার হবো! সুতরাং, খেদাও এঁদের! ফ্রন্টলাইন-এ থাকা প্রশাসনিক আধিকারিক থেকে সাধারণ কর্মী—অনেকেই শিকার হয়েছেন সামাজিক হেনস্থার।

করোনা-আক্রান্তের মৃতদেহ ফিরিয়ে আনতে হয়েছে শ্মশান থেকে! স্থানীয় মানুষের বাধায় দাহ করা যায়নি, রাতের অন্ধকারে প্রশাসন দাহ করে জঞ্জাল ফেলার মাঠে। অথচ, জলাতঙ্কে মৃত কোনো ব্যক্তিকে কখনো এই অবমাননার মুখোমুখি হতে

হয়নি। মৃতদেহে আট ঘন্টার বেশি ভাইরাস টিকে থাকে এমন কোনো তথ্য কোনো ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞ এখনও জোগাড় করতে পারেননি।

করোনা ভাইরাসের সংক্রমণে আক্রান্ত হওয়া কি কোনো অপরাধ? লেবেল দেগে দেওয়া হচ্ছে তাঁদের গায়ে। তাঁদের অপরাধী হিসাবে গণ্য করা হচ্ছে? তাঁদের পরিবারের উদ্দেশ্যে ছুটে আসছে নানা বাক্যবাণ। বাড়িতে যদি কেউ আক্রান্ত হন— রীতিমতো আতঙ্কে থাকছেন সেই পরিবারের মানুষ, যতটা না করোনা-সংক্রমণের কারণে, তার থেকে বেশি সামাজিক হরেক রকম হয়রানির আশঙ্কায়। গোপনীয়তার সমস্ত নৈতিকতা জলাঞ্জলি দিয়ে সংবাদ মাধ্যমে চলছে এক ধরনের খাপ পঞ্চায়েত। আক্রান্তকে একবারও না-দেখেই দেগে দেওয়া হচ্ছে, 'বর্ডারলাইন পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডার'-এর ছাপ। এই অসংবেদনশীলতাও বোধহয় আমাদের 'অর্জন'।

পরে বিভিন্ন সূত্রে খোঁজ নিয়ে দেখেছি, আমাদের অনেক সহনাগরিকের এমন আচরণের মূলে শুধুমাত্র 'কোভিড ১৯'-এর সংক্রমণের আতঙ্ক কাজ করেছে এমন নয়। অনেক ক্ষেত্রে পুরোনো কোনো রেষারেষি, অসূয়া, ঈর্ষা, বিদ্বেষ, রাগও সুপ্ত থেকেছে।

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ চারদিকে করোনা ছড়িয়ে দিচ্ছে, এই বিদ্বেষপূর্ণ প্রচার দেখেছি আমরা, দেখেছি তেলেনিপাড়ার দাঙ্গায় কেমন ভাবে করোনা ভাইরাস সংক্রমণকে সামনে রেখে ধর্মান্ধতার ভাইরাস ছড়ানো হয়েছে, যার পরিণতিতে পুড়েছে বহু ঘর-বাড়ি, দোকানপাট, আহত হয়েছেন বহু মানুষ।

করোনা ভাইরাস সংক্রমণের আশঙ্কা আজ সামাজিক জীব হিসাবে আমাদের কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

আমরা যে মানবিকতার কথা বলি, যে শিক্ষা-দীক্ষার কথা বলি, যে সভ্য আচরণের কথা বলি— এগুলো আমরা অনেকেই হঠাৎ যেন ভুলে গেলাম। মনের মধ্যেকার স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক, নখ-দাঁত বের করা উন্মত্ততাই আমাদের পরিচয় হয়ে দাঁড়ালো! তাহলে কি বিপর্যয়ের সময়েই আমাদের আসল চেহারা উন্মোচিত হয় সমস্ত আড়াল সরে গিয়ে! অন্যের অবস্থানে, তাঁর পরিস্থিতিতে নিজেকে রেখে, তাঁর অনুভূতিকে বোঝার সংবেদনশীলতা হারিয়ে ফেলেছি আমরা।

মানুষের মানবিক বোধের, মনুষ্যত্বের আসল পরীক্ষা বিপর্যয়ের দিনে, সংকটের সময়ে। সেই সময়েই আমাদের মানবিক সত্তা কতটা দৃঢ়, তা বুঝে নিতে পারি। এই সময়ে আমাদের অনেকেরই মানবিক, সভ্য, ভদ্র মুখোস নিজেদের অজান্তেই খসে পড়ে, বাইরে বেরিয়ে আসে ভিতরের সংকীর্ণ স্বার্থপরতা, হিংস্রতা। করোনা ভাইরাস সংক্রমণের এই অতিমারীর সময়ে এমনই কিছু দৃশ্যের মুখোমুখি হলাম আমরা, এমনই কিছু অভিজ্ঞতা আমাদের হলো যেখানে মনুষ্যত্বের অবমাননাই প্রকট হয়ে উঠলো।

পাড়া সম্পর্কে আপনি যা বলেছেন, তা সর্বত্র এক রকম ভাবে না-হলেও অনেক জায়গায় দুঃখজনক বাস্তবতা। শহর-মফস্বলের ক্রমশ 'কসমোপলিটন'-এ বদলে যাওয়া পুরোনো 'পাড়া'-র চেহারা বহু জায়গায় আমূল পাল্টে দিল। পুরোনো দিনের সেই পাড়া-সংস্কৃতিও এখন অনেক জায়গায় ক্ষয়িষ্ণু। ভোটের রাজনীতির প্রয়োজনে বাংলার সার্বিক সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের প্রতিফলন পাড়ার ওপরেও পড়েছে অনেকটা। তবে এই সময়ে, অনেক জায়গায় পাড়ার ছেলেমেয়েদের মানুষের পাশে দাঁড়াতেও দেখলাম আমরা। অনেক অন্ধকারের মধ্যেও এটাই হয়তো আলোর লক্ষণ।

পৃথিবীতে কোনো বিপর্যয় ব্যক্তি মানুষ একা সামাল দিতে পারেনি, পারা সম্ভবও নয়। তা সে ভয়াবহ বন্যা হোক্ বা সুপার সাইক্লোন হোক্ কিংবা মহামারী। সাম্প্রতিককালে পশ্চিমবঙ্গে আছড়ে পড়া সাইক্লোন 'আমপান' আর 'কোভিড ১৯'-এর সংক্রমণ আমাদের শিখিয়ে দিয়ে গেল বিপর্যয়ের সামনে একা আমরা বাঁচতে পারি না, বুঝিয়ে দিয়ে গেল শুধু সরকারের ওপর নির্ভর করলেও কী দুরবস্থা হতে পারে! এই অভিজ্ঞতা থেকে শিখে যদি আমরা আবার নতুন করে ভিন্ন মত, ভিন্ন যাপন সত্ত্বেও বিপদে-আপদে একসঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলা অভ্যাস করতে পারি! তাহলে বিপর্যয়ের মুখে এতটা অসহায় বোধ হবে না, যতটা এবার অনেকে উপলব্ধি করলাম!

▪ **শুভেন্দু** : আগে দেখা যেত, যাঁদের নানা কারণে বাড়িতে থাকতে হতো, তাঁরা বই পড়তেন, পড়া বই নিয়ে কথা বলতেন, লিখতেন, লেখা হয়ে গেলে পড়ে শোনাতেন, বড়রা ছোটদের গল্পের বই পড়ে শোনাতেন, টিভিতে দল বেঁধে খেলা দেখা, জমিয়ে আড্ডা দেওয়া, একটা 'পরিবার' হয়ে ওঠা সবার সঙ্গে সবার থাকার মধ্য দিয়ে!

এখন এই যে 'আধুনিকতা'-র নামে, 'প্রগতি'-র কৈফিয়তে 'ছোট পরিবার, সুখী পরিবার' হয়ে গেলাম, কথা, সমস্যা, আনন্দ, বোঝা, দুঃখ ভাগ করার জায়গা ভেঙ্গে দিলাম, তোমার কি মনে হয়, এটাও 'এই সময়ে' মন খারাপের একটা কারণ?

▪ **মোহিত** : শুভেন্দু দা, এটা আপনি ভালো বলতে পারবেন, কীভাবে, কোন্ অর্থনৈতিক পরিবর্তনে আগের দিনের যৌথ-যাপন ভেঙে যায়! আমার ধারণা ভুল হতে পারে, আপনি সংশোধন করে দেবেন অবশ্যই! আমার যতটুকু মনে হয়, আমাদের সমাজ কাঠামো বদলের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক পরিবর্তন একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। গ্রামের কৃষি-নির্ভর যূথবদ্ধতা থেকে যখন চাকরির জন্য মানুষ শহর পানে ছুটলো, তখনই যৌথ পরিবার একটু একটু করে ভাঙতে শুরু করলো। এককভাবে বাঁচার শুরু সম্ভবত এখান থেকেই! একটু একটু করে বাড়তে থাকলো একক পরিবারের সংখ্যা, ভাঙতে থাকলো যৌথতা। যৌথতার ছবি তখনও ফুটে উঠতো কোনো পারিবারিক

উৎসব-অনুষ্ঠানকে ঘিরে। এরপর একক পরিবারের সদস্যরা যখন বাড়ির বাইরে যেতে শুরু করলেন পেশাগত কারণে, গ্রাম ছেড়ে, শহর ছেড়ে, দূরে, এমন কি বিদেশ-বিভুঁইয়ে যেতে শুরু করলেন, তখন একক পরিবার আরও ছোট আকার নিলো। অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার সঙ্গে বাড়ল আমাদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বোধ। আমাদের কাছে তখন আর একটু 'পার্সোনাল স্পেস', আর একটু ব্যক্তিগত স্বাচ্ছন্দ্য গুরুত্ব পেল। এই 'স্পেস' হয়তো প্রয়োজন, কিন্তু এই স্পেস-এ খুব কাছের মানুষটির প্রবেশাধিকারও থাকে না অনেক সময়। তাই কাছে থাকা মানুষও এক সময় দূরের হতে থাকে। সেই দূরত্ব কোনো কোনো সময় একাকিত্বের কিনারায় এনে দাঁড় করায় আমাদের মধ্যে কিছু মানুষকে। সেই একাকিত্বের মধ্যে থাকতে থাকতে উঁকি দিতে শুরু করে মন খারাপ, যা অনেক সময় বিষণ্ণতার দিকেও ঠেলে দেয় আমাদের।

▪ **শুভেন্দু** : অর্থনীতির কথায় ফিরে আসি আগের প্রশ্নটা ধরেই। একসঙ্গে অনেকের থাকার একটা সুবিধা ছিল, আমার কাজ চলে গেলে, আমার আয় কমে গেলে, বাকিরা সামাল দেবে, এখন তো সামলাবার কেউ নেই। এটাও কি দুশ্চিন্তার একটা কারণ?

▪ **মোহিত** : ঠিক এই অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে আমি নিজেও গেলাম কিছু দিন আগেই। আমি পেশাগতভাবে যে কাজটা করি, তা মূলত কাউন্সেলিং। চেম্বার না করলে উপার্জন বন্ধ। গত ২১ মার্চ আমি উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ার থেকে কলকাতায় ফিরি। পরের দিন জনতা কারফিউ। আমি কলকাতায় সন্ধ্যা নাগাদ ফিরেই চলে গিয়েছিলাম শ্রীরামপুরে, ওখানে আমাদের তিন ভাইয়ের বাবা-মাকে নিয়ে যৌথ পরিবার। বিবাহিত বোনও কাছেই থাকে। আমার বউ আর কন্যা তখন ওখানেই। ২২ মার্চ রাত আটটায় মাত্র চার ঘন্টার নোটিশে পুরো দেশে সর্বাত্মক 'লক ডাউন' ঘোষণা হলো। আটকে পড়লাম ওখানেই। টাকা জমানোর অভ্যাস নেই বললেই চলে। হাতে টাকা থাকলেই বই কেনা আর বেড়াতে যাওয়ার নেশা দীর্ঘদিনের। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই টাকার ভাঁড়ারে টান ধরলো। এর মধ্যেই প্রথমে আমি প্রবল 'ভার্টিগো', পরে 'কোভিড ১৯'-এ আক্রান্ত হয়ে শ্রীরামপুরের শ্রমজীবী কোভিড হাসপাতালে ভর্তি হলাম। এই সময়ে আমার দুই ভাই, বোন আর আমার আর এক নিকটজন দাদা পাশে না থাকলে সত্যিই চরম সমস্যায় পড়তাম। কিন্তু, সত্যিই এই পর্বে তেমন করে আঁচ লাগেনি আমার। অবশ্য আমার প্রিয় অনেক মানুষ পাশে এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁদের মধ্যে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আমার প্রিয় শিক্ষক সৌমিত্র বসু অন্যতম। অনেকেই বারংবার টাকা পাঠাতে চেয়েছেন। সেভাবে প্রয়োজন হয়নি বলেই নিইনি তাঁদের কাছে। তেমন অসুবিধায় পড়লে অবশ্যই নিতাম। আপনি যে কথা বলছিলেন

তা নিজের অভিজ্ঞতাতেই উপলব্ধি করলাম। একসঙ্গে থাকার মধ্যে কিছু কিছু মত পার্থক্য থাকে, অসুবিধা থাকে, আবার মানিয়ে নেওয়াও থাকে, আখেরে প্রাপ্তি থাকে অনেক বেশি, নিশ্চিন্ত হওয়া যায়, থাকে নিরাপত্তা।

এই সুযোগ যাঁদের থাকে না, তাঁদের মধ্যে কতটা নিরাপত্তাহীনতা তৈরি হয়, তা আমার পরিচিত বেশ কয়েকজনের মধ্যে দেখেছি এই 'লক ডাউন'-এর সময়েই। বিপন্ন বোধ করেছেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই।

▪ **শুভেন্দু** : একবার যখন অর্থনীতিতে এসে গেছি, আর একটু থাকি। আমি কয়েকজনকে জানি, তাদের সঙ্গে কথা হয়, ছোটো সংস্থা চালায়, কয়েকজন কর্মচারী, অনেকদিন ধরে আছে। সংস্থার এখন কাজ নেই, তাই আয় নেই, কর্মচারীদের বলতে পারছেন না যে তিনি আর বেতন দিতে পারবেন না। ফলে মানসিক যন্ত্রণায় রয়েছেন। এই যে সহমর্মিতা, এর যে সমস্যা, এর কি কোনো দাওয়াই আছে তোমার কাছে?

▪ **মোহিত** : ঠিক একই কথা শুনেছি আমার আরও দু'একজন বন্ধুর কাছে, যারা ছোটো মাপের উদ্যোগী বা ব্যবসায়ী।

এই উদ্যোগীদের মনে তাঁদের সহকর্মীর প্রতি যে সহমর্মিতা রয়েছে, তা এখনকার এই আত্মকেন্দ্রিকতা আর মুনাফা-সর্বস্ব বাজারে টিকে থাকা যথেষ্ট প্রশংসার।

এক্ষেত্রে মানসিক স্বাস্থ্য কর্মী হিসাবে আমার বলার এটুকুই যে সেই 'মালিক' যে মানসিক যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন তাঁর সহকর্মীদের প্রতি সহমর্মিতার বোধ থেকেই, সেই অসহায়তার এবং মানসিক যন্ত্রণার অনুভূতি মনের মধ্যে জমিয়ে না রেখে কোনা না কোনোভাবে ভেন্টিলেট বা প্রকাশ করা প্রয়োজন। আমরা সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর থেকে যত রকম অনুভূতির মধ্যে দিয়ে যাই, তার খুব অল্পই আমরা খেয়াল করি, চিনতে পারি, সচেতনভাবে বুঝতে পারি। যত রকম অনুভূতিকে চিনতে বা বুঝতে পারি তারও খুব অল্পই প্রকাশ করতে পারি। প্রকাশ করতে না-পারা অনুভূতিগুলো জমতে থাকে মনের মধ্যেই। সেইসব অপ্রকাশিত-অবদমিত অনুভূতি কোনো এক সময় বিস্ফোরিত হয় প্রেসার কুকারের মতোই। তাই নিজের মধ্যেকার এই অনুভূতিগুলোকে চেনা এবং প্রকাশ করা, দুটোই খুব জরুরি। এছাড়া আর একটা কথা ভাবতে পারি আমরা, 'আন লক' প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে অনেক ক্ষেত্রেই, সম্ভব হলে সেই কর্মীদের সঙ্গে বসে নিজের সমস্যা, এবং অনুভূতির কথা বলে বিকল্প কী কী পন্থা নেওয়া যায়, তা নিয়ে কথা বলা যেতে পারে, বিকল্প উপায়ের সন্ধান করা যেতে পারে। হতে পারে তাঁদের ভাবনা থেকেও কোনো নতুন ভাবনা, নতুন পথ খুঁজে পাওয়া গেল।

▪ **শুভেন্দু** : তোমার কাউন্সেলিং পেশার জীবনে, মানুষের মনের কষ্ট দূর করার সহায়ক জীবনে, কখনও কি এর থেকে বেশি কষ্ট পাবার কোনও সময় মনে করতে পারো? আজকের সময়টাকে তুমি কি মাপে আলাদা বলে ধরবে?

▪ **মোহিত** : শুভেন্দু দা, আমার পেশাগত জীবনে আমি কাশ্মীরের মানুষের মুখোমুখি হওয়ার সুযোগ পাইনি। সারা ভারত থেকে কাশ্মীর সম্পূর্ণ আলাদা। বিশেষ করে গত এক বছরে কাশ্মীরের মানুষ যে ট্রমা বা ক্ষত-র মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন, তার কোনো তুলনা হয় না। একজন সচেতন এবং দায়িত্বশীল ভারতীয় হিসাবে আমি ওঁদের অনুভূতির প্রতি সহমর্মী। ওঁদের যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত হই।

সেই কাশ্মীরকে বাদ দিলে সারা ভারতের মানুষ এই 'কোভিড ১৯' সংক্রমণের সময়ে যে ব্যাপক সংখ্যায় মানসিক কষ্টের মুখোমুখি হলেন তা আমার পেশাগত জীবনে অতুলনীয়। 'লক ডাউন'-এর ফলে, রুজি রোজগার হারানো মানুষ, প্রবাসী শ্রমিক, ক্রনিক অসুস্থতায় আক্রান্ত মানুষ, চিকিৎসা না-পাওয়া মানুষ, কাছের মানুষকে হারানো মানুষ, উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় আক্রান্ত মানুষ, বিষণ্ণতার শিকার মানুষ, পড়াশোনা-পরীক্ষা-চাকরির অনিশ্চয়তায় থাকা পড়ুয়া...সমাজের সব স্তরের এত বিপুল সংখ্যক মানুষ এই সময়ে যে মানসিক যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে গেছেন তা এর আগে আমার চোখে পড়েনি! এমন অবস্থা এর আগে কখনো দেখিনি। এই পরিস্থিতিতে এই বিপুল সংখ্যক মানুষের মনে যে ক্ষত তৈরি হলো, তার পরিমাপ কীভাবে সম্ভব জানি না! এর উত্তর হয়তো সাইকো-সোশ্যাল-ইকোনমিক্যাল ইন্টিগ্রেটেড স্টাডি বা মনস্তাত্ত্বিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক সমন্বিত সমীক্ষার মধ্যে দিয়ে কিছুটা উঠে আসতে পারে!

▪ **শুভেন্দু** : একটা কথা খুব বলা হয়, ১৯৮০ দশকের মাঝখান থেকে যে 'নতুন অর্থনীতি' এলো, যাকে ইংরাজিতে 'নিও-লিবারাল ইকোনমি', বাংলায় 'নয়া উদার অর্থনীতি', 'অবাধ অর্থনীতি', 'পণ্য বাজার অর্থনীতি' নানা নামে ডাকা হয়। তার পর থেকে এই নতুন অর্থনীতি আমাদের সমাজ, পরিবার, ব্যক্তিকে বদলে দিতে থাকলো। শুধু কেনো, যা পারো কেনো, যত পারো কেনো, কেনার জন্য ধার করো, এখনই টাকা না-থাকলে কার্ডে কেনো, তোমার আদৌ প্রয়োজন থাকুক বা না-থাকুক কেনো, যেভাবেই পারো পণ্য ভোগ করো! এই যে বদলে যাওয়া অর্থনীতি, এটা কি আমাদেরকে, বিশেষতঃ মধ্যবিত্তকে স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক করে তুললো? নিজেরটা নিজে বোঝো, অন্যেরটা বোঝার দরকার নেই, 'পাড়া' ছেড়ে দিয়ে 'মাল্টিস্টোরিড অ্যাপার্টমেন্ট'-এ ঢুকে পড়া, এখন এই 'কোভিড ১৯' অসুখের 'ভয়' কি আমার এই 'একা একা' হয়ে যাওয়াকে, ছোটো পরিবারকে বেশি করে ভয় পাওয়াচ্ছে, যা হয়তো 'পাড়া'-র সবার সঙ্গে মিলে মিশে, সবার মতো থাকলে হতো ন?

▪ **মোহিত** : 'নয়া-উদার অর্থনীতি'-র সঙ্গে আমাদের আত্মকেন্দ্রিকতা, স্বার্থপরতার যে সংযোগের কথা আপনি বললেন, তা আমারও মনে হতো। কিন্তু 'নয়া উদার অর্থনীতি-পণ্য ভোগী যাপন-আত্মকেন্দ্রিকতা-স্বার্থপরতার এই পারস্পরিক সংযোগ এত সুন্দর করে আপনি তুলে ধরলেন, এভাবে এর আগে ভাবিনি। আপনার সঙ্গে সহমত আমি এই সংযোগ নিয়ে। তবে 'পাড়া' ছেড়ে 'মাল্টিস্টোরিড'-এ ঢুকে পড়া অনেকের ক্ষেত্রে কম্পালশন বা বাধ্যবাধকতাও ছিল। ধরুন, কাজের সূত্রে বাড়ি থেকে বেশ দূরে যেতে হচ্ছে বা থাকতে হচ্ছে যাঁদের, বাড়ি করার সাধ থাকলেও সাধ্য নেই, তাঁদের অনেকেই অন্য কোথাও তুলনামূলক কম দামের ফ্ল্যাট-বাড়ি খুঁজেছেন। আবার অনেকেই এমন আছেন, যাঁদের বাড়িতে স্থান সংকুলানের সমস্যা, তাঁরাও অনেকে মাথা গুঁজেছেন 'মাল্টিস্টোরিড অ্যাপার্টমেন্ট'-এ।

আমি প্রথম দিকে একটা কথা বলেছিলাম, কসমোপলিটন শহরগুলোতে সেই 'পাড়া' আর নেই! বদলে গেছে তার ভূগোল, তার প্রকৃতি, তার সংস্কৃতি। কিন্তু, কোথাও কোথাও 'পাড়া' তার পুরোনো সামাজিক চরিত্র নিয়ে রয়ে গেছে এখনও। এই 'পাড়া' ছেড়ে আসা মানুষদের নিয়ে কোথাও কোথাও 'মাল্টিস্টোরিড অ্যাপার্টমেন্ট'-এ বসবাসকারীদের নিয়ে গড়ে উঠেছে এক একটি অন্য রকম 'পাড়া', সেখানে পারস্পরিক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া আছে, বিপদে-আপদে পাশে দাঁড়ানো আছে। কিন্তু, দুঃখজনক ভাবেই এমনটা সব জায়গায় নেই। যেখানে এই সহযোগিতার আবহ নেই, সেখানে অসুস্থ হলে, চিকিৎসা নিয়ে দুর্ভাবনা আছে, অসহায়তা আছে। এছাড়াও সেখানে অনেক মানুষের মনে প্রতিবেশীকে নিয়েই সংশয় আছে, ভয় আছে, সামাজিক হেনস্থার শিকার হওয়ার আশঙ্কাও আছে।

▪ **শুভেন্দু** : বেশিরভাগ কথা মধ্যবিত্তকে নিয়ে হচ্ছে, তার কারণ তুমি আর আমি এখানেই আছি। খানিকটা জানি, বুঝি।

এর নিচে যে নিম্নবিত্ত, দরিদ্র মানুষরা, তাঁদেরও তো মন খারাপ হচ্ছে, ভয়-দুশ্চিন্তা হচ্ছে, যা হয়তো তোমাদের কাছে এসে পৌঁছোচ্ছে না! সেখানে কী করা?

▪ **মোহিত** : নিম্নবিত্ত, দরিদ্র মানুষ এই কোভিড-কালে যে বিপর্যয়ের মধ্যে দিয়ে গেছেন, তা মধ্য বা উচ্চবিত্তের মানুষকে সেভাবে যেতে হয়নি। একদিকে আমাদের দেশ পৃথিবীতে সর্বোচ্চ খাদ্য উৎপাদনকারী, অন্যদিকে উৎপাদিত খাদ্যের চল্লিশ শতাংশ নষ্ট হয়ে যায়, দেশবাসী পায় না! পৃথিবীর চারভাগের একভাগ নিরন্ন মানুষের বসবাস ভারতে। অপুষ্টির শিকার শিশুদের সংখ্যা এই 'এই মেরা ভারত মহান'-এই পৃথিবীর মধ্যে সব থেকে বেশি। 'লক ডাউন'-এ খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থা পুরোপুরি যখন ভেঙ্গে পড়লো, তার কী পরিণতি হতে পারে তা ভাবলে শিউরে উঠতে হয়!

নিম্নবিত্তের বহু মানুষ 'লক ডাউন'-এর কারণে রুজিরোজগার হারিয়েছেন। অনেকে দীর্ঘদিনের অভ্যস্ত পেশা ছেড়ে একেবারে অনভ্যস্ত কোনো পেশা বা কাজ বেছে নিয়েছেন। দর্জির কাজ জানা মানুষ সব্জি বিক্রির পসরা নিয়ে বসেছেন রাস্তার ধারে। আবার সব্জি বাজারের দোকানি এই পরিস্থিতিতে পড়েছেন কঠিন প্রতিযোগিতার মধ্যে, কমে গেছে তাঁর উপার্জন। গ্রাম কিংবা মফস্বল থেকে আসা দলে দলে গৃহকর্মে সহায়িকাদের কাজে যাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে, বন্ধ হয়েছে অনেকের উপার্জনের পথ। সুন্দরবনের গ্রাম থেকে মেয়েদের কলকাতায় এসে দোরে দোরে সাহায্য চাইতে শুনছি। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মধ্যে পড়ে না, এমন জিনিসপত্রের ছোট ব্যবসায়ী বা দোকানিরা নিদারুণ সঙ্কটের মুখোমুখি। বহু মধ্যবিত্ত মানুষ নিম্নবিত্তে নাম লিখিয়েছেন, এটাও চোখে পড়েছে। মধ্যবিত্ত পরিবারের বউ পাড়া থেকে দূরে গিয়ে রান্নার কাজ খুঁজছেন। এই বিপর্যয়ের প্রভাব এঁদের মনের ওপর প্রবলভাবেই পড়েছে। এই সময়ে বহু মানুষের ফোন পেয়েছি, যাঁদের আর্থিক সামর্থ্য নেই, অথচ মানসিক পেশাদারের সহায়তা প্রয়োজন। তাঁদের মনের মধ্যে যে সংকোচ, যে উদ্বেগ উৎকণ্ঠা, নিরাপত্তাহীনতা, অসহায়তা, বিষণ্ণতা দেখেছি তাতে নিজেই বড় অসহায় বোধ করেছি অনেক সময়। গুটিকয়েক মানসিক স্বাস্থ্যের পেশাদারের পক্ষে এই বিপুল সংখ্যক মানুষের পাশে দাঁড়ানো সত্যিই কঠিন।

এমনিতেই আমাদের দেশে মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে সাহায্যকারীর সংখ্যা সাহায্যপ্রার্থীর তুলনায় খুবই সামান্য। এই মুহূর্তে রাতারাতি কিছু করে ফেলা কঠিন, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদি কিছু পরিকল্পনা অবশ্যই নেওয়া যায়।

এই পরিস্থিতিতে, জনস্বাস্থ্যের পরিধিতে মানসিক স্বাস্থ্যকে অন্তর্ভুক্ত করা খুব জরুরি। ক্লিনিক-নির্ভর চিকিৎসার ওপর সবটা নির্ভর না-করে, সমাজ-নির্ভর মানসিক স্বাস্থ্য সচেতনতা ও সহমর্মিতার বাতাবরণ তৈরি করা জরুরি। প্রয়াত অমল সোম, ডাঃ কে এল নারায়ণন, জয়েস শিরোমণি, ডাঃ জোতির্ময় সমাজদার, রবিন চক্রবর্তী, ডাঃ সত্যজিৎ আশ, রত্নাবলী রায় এবং আরও অনেকে এই সমাজ-নির্ভর মানসিক স্বাস্থ্য পরিষেবার কথা ভেবেছিলেন। 'মানস' তৈরি হয়েছিল মনোরোগী-তাদের পরিবার-বন্ধু-মানসিক স্বাস্থ্যের পেশাদারের সমন্বয়ে মানসিক স্বাস্থ্য-বন্ধু সমাজ গড়ে তোলার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে। গৃহহীন মনোরোগীদের পাশে দাঁড়াতে গড়ে উঠেছিল 'ঈশ্বর সংকল্প'। 'মন ফাউন্ডেশন' চেষ্টা করেছিল স্কুলে স্কুলে গিয়ে শিক্ষকদের কাউন্সেলর হিসাবে প্রশিক্ষণ দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের মানসিক অসুবিধার প্রাথমিক পর্যায়েই সাহায্যের ব্যবস্থা গড়ে তুলতে। মানসিক রোগীদের সামাজিক পুনর্বাসনের লক্ষ্যে গড়ে উঠেছিল 'পরিপূর্ণতা', 'অঞ্জলি'। 'অঞ্জলি'-র 'জনমানস' নামের সমাজ-নির্ভর প্রকল্প উত্তর চব্বিশ পরগনার বিরাটি অঞ্চলে জরুরি ভূমিকা নিয়েছে।

আরও গুরুত্ব দিয়ে, নতুন করে মানসিক স্বাস্থ্যকে জনস্বাস্থ্যের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখা শুরু করা জরুরি। স্বাস্থ্য অধিকার এবং নাগরিক অধিকার আন্দোলনের পক্ষ থেকেও এই দাবি উঠুক, জনস্বাস্থ্য বিষয়ের মন্ত্রককে শুধু 'জনস্বাস্থ্য কারিগরি'-র মধ্যে সীমাবদ্ধ না-রেখে সত্যিকারের 'জনস্বাস্থ্য' উদ্যোগ নেওয়া হোক্, যেখানে শারীরিক ও মানসিক অসুখ ও সেগুলোর প্রতিরোধ সম্পর্কে সচেতনতা, পর্যাপ্ত পুষ্টি ও খাদ্যের নিরাপত্তা, স্বচ্ছ পানীয় জল সরবরাহ, প্রতিটি শিশু-কিশোরের জন্য জীবনকুশলতা শিক্ষা, তামাক-মাদক নির্ভরতার কুফল ও ঝুঁকিপ্রবণ আচরণ সম্পর্কে সচেতনতা, অসুখ হলে কাছের হাসপাতালে সবরকম চিকিৎসার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হোক্।

এর পাশাপাশি সমাজের অন্য সব স্তরের মানুষ পাশে এসে দাঁড়াক এই সহায়-সম্বলহীন মানুষের পাশে। এই করোনা সংক্রমণের সময়ে আমরা এই মানুষদের গুরুত্ব অনেকেই উপলব্ধি করেছি। আমাদের সভ্যতার চাকা এই শ্রমজীবী মানুষের ঘাম, রক্ত ঝরানো শ্রমের মূল্যেই গড়ায়। সেই সত্যকে বুঝতে না চাইলে তা আমাদেরই সমস্যা।

▪ **শুভেন্দু** : মনের ডাক্তারদের সংগঠন আছে, তোমরা কি এই মন খারাপ অবস্থার মোকাবিলায় সাংগঠনিক ভাবে কিছু ভাবছো?

▪ **মোহিত** : শুভেন্দু দা, আমি 'ডাক্তার' নই। মনের ডাক্তারদের রাজ্যস্তরের সংগঠনের পক্ষ থেকে 'কোভিড ১৯' সংক্রমণের সময়ে কয়েকজন ডাক্তারবাবুর নাম আর হেল্প লাইন ফোন নম্বর দিয়ে মানুষকে সাহায্যের চেষ্টা হয়েছিল। কিছু কিছু সংগঠনও এই ধরনের কিছু হেল্প লাইন চালু করেছিল। তবে বেশ কিছু ক্ষেত্রে হেল্প লাইনের কিছু নম্বরে বারংবার ফোন করেও কোনো সাড়া পাওয়া যায় নি, এমন অভিযোগও অবশ্য শুনেছি।

এই মুহূর্তে কোভিড-সংক্রান্ত মানসিক ও সামাজিক বিষয়গুলো নিয়ে 'কোভিড কেয়ার নেটওয়ার্ক'-এর মধ্যে থেকে কিছু উদ্যোগ নেওয়ার চেষ্টা করছি। তবে এই বিষয়ে মানসিক স্বাস্থ্য পরিবারের কাছে প্রত্যাশা ছিল অনেক, কিন্তু দুঃখজনক ভাবেই তেমন কিছু চোখে পড়েনি!

▪ **শুভেন্দু** : তুমি একজন কাউন্সেলর হিসাবে পাঠকদের কিছু কথা বলবে? কী কী করলে মন খারাপ হবে না? বা, মন খারাপ হলে কী কী করবে? —যাতে ঘরে থেকে নিজেই খানিকটা সামলে নেওয়া যায়?

▪ **মোহিত** : এর আগে কিছু কথা এই প্রসঙ্গে বলেছি। তবু আর একবার মনে করিয়ে দিই।

বিপর্যয়ের এই দিনগুলোতে অল্প মাত্রায় উদ্বেগ উৎকণ্ঠা, দুশ্চিন্তা, মন খারাপ কিংবা অল্প মাত্রার বিষণ্ণতা অস্বাভাবিক নয়। আমরা এই অল্প মাত্রার দুশ্চিন্তা বা উদ্বেগ উৎকণ্ঠা কিংবা মন খারাপ বা বিষণ্ণতা কাটিয়ে উঠতে কী করতে পারি?

- এটা বুঝে নিতে পারি, এই বিপর্যয়ের পরিস্থিতিতে এমন উদ্বেগ উৎকণ্ঠা, মন খারাপ বা অল্প মাত্রার বিষণ্ণতা স্বাভাবিক। সংবেদনশীল মনে তার প্রভাব হয়তো কিছুটা বেশিই! এ শুধু আমারই হচ্ছে— এমন নয়, অনেকেই এই পরিস্থিতির শিকার। মনের এই অসুবিধাকে চেনা এবং মেনে নেওয়া জরুরি।
- একটু শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যায়াম করতে পারি। সোজা হয়ে চেয়ার-টুল-মোড়ার ওপর কিংবা মেঝেতে বসে— খুব ধীর গতিতে দীর্ঘ শ্বাস নেওয়া, আর ধরে না-রেখে খুব ধীরে প্রশ্বাস ছাড়া। সকাল-বিকাল কিংবা যখনই অস্থিরতা বা টেনশন অনুভব করবো, তখনই কিছুক্ষণ দু'চোখ বন্ধ করে করতে পারলে অস্থিরতা ও টেনশন একটু কমবে।
- মন খুলে বলা যায়—এমন কেউ বাড়িতে থাকলে তাঁর কাছে কিংবা ফোন বা সোশ্যাল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে কোনো আত্মজন বা বন্ধুর কাছে বলা। নিজের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা-মন খারাপ-বিষণ্ণতার কথা বলতে না-পারলে, মন খুলে লিখতে পারলেও সেই জমে থাকা অনুভূতির তীব্রতা কিছুটা কমে, মনের ভার কিছুটা হালকা হয়।
- টেলিভিশন বা সোশ্যাল নেটওয়ার্কের সামনে যদি দীর্ঘক্ষণ আমরা বসে এই করোনা সংক্রমণ বিপর্যয়ের খবর শুনতে থাকি, দেখতে থাকি...তাহলে আমাদের মন ওর মধ্যেই আবদ্ধ হয়ে থাকবে, বেরোতে পারবে না, বাড়তে থাকবে আমাদের দুশ্চিন্তা-উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা-ভয় ও আশঙ্কার মাত্রা। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ-সংক্রান্ত খবর সম্পর্কে সচেতন থাকা অবশ্যই প্রয়োজন, এর জন্য দিনে বার দুয়েক টেলিভিশনে বা করোনা আপডেট-সংক্রান্ত কোনো হেল্প ডেস্ক থেকে খবর দেখে নিলেই যথেষ্ট। সর্বক্ষণ ওই একই বিষয় নিয়ে পড়ে থাকলে মনের ওপর চাপ বাড়তেই পারে।
- করোনা সংক্রমণ নিয়ে চারপাশে অজস্র অবৈজ্ঞানিক ও হোয়াটস্ অ্যাপ ইউনিভার্সিটি সৃষ্ট খবর ভেসে বেড়াচ্ছে। এই কাহিনীগুলো কতটা সত্যি, কতটা যুক্তিযুক্ত— তা আমরা যাচাই না-করে অযথা আতঙ্কের শিকার হচ্ছি। এইসব বৃত্তান্তের তথ্যসূত্র খুঁজতে গেলে নির্ভরযোগ্য কিছু পাওয়া যাচ্ছে না, কিন্তু ততক্ষণে তা ভাইরাল হয়ে যাচ্ছে করোনার সংক্রমণের মতোই!

  ফেক নিউজ ও পোস্ট ট্রুথ-এর এই রমরমার যুগে আমরা বরং কোনো সংবাদের

ওপর ভরসা করার আগে তার তথ্যসূত্র, সেই তথ্যসূত্রের বিশ্বাসযোগ্যতা, সেই সংবাদের যুক্তিগ্রাহ্যতা নিজের যুক্তিবোধ দিয়ে ভালোভাবে যাচাই করে নিই। তাতে ঠকে যাওয়ার আশঙ্কা কমে। অযথা উদ্বেগ কমে, অকারণ বিদ্বেষ থেকে বাঁচি।

- উদ্বেগ উৎকণ্ঠা কিংবা মন খারাপের মাত্রা তীব্র হলে মানসিক স্বাস্থ্যের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত, তাঁদের সহায়তা নেওয়া প্রয়োজন। কিছু ক্ষেত্রে ওষুধের ভূমিকাও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।
- শেষে, ভিক্টর ফ্র্যাঙ্কল-এর সেই অভিজ্ঞতার কথা মনে রাখতে বলবো।

▪ **শুভেন্দু** : এই মন খারাপের সময়ে কার কী কাজ? ব্যক্তির, পরিবারের, আত্মীয় স্বজনের, বন্ধু বান্ধবদের, পাড়া-র, সামাজিক সংগঠনের, চিকিৎসকদের, চিকিৎসকদের সংগঠনের, স্থানীয় প্রশাসনের, রাজ্য সরকারের?

একজনের ভয় পাবার কারণের উদাহরণ দিই। আমার কথাই ধরো! আমার যেই একটু জ্বর এলো, একটু সর্দিকাশি

... ব্যাস, আমার ভয় পাওয়া শুরু হয়ে গেল, আমার কি 'কোভিড' হলো? আমি কি ডাক্তারবাবুকে বলবো? উনি কি 'টেস্ট' করতে বলবেন? কোথায় 'টেস্ট' করাবো? 'টেস্ট' যদি 'পজিটিভ' হয়, তাহলে কোথায় যাবো? সরকারী হাসপাতালে যদি জায়গা না পাই? বেসরকারী হাসপাতাল কত লক্ষে থামবে, জানা নেই। আমার কাছে তো সেই টাকা নেই! আমার 'কোভিড' হলে পরিবারের বাকিদের কী করতে হবে? পাড়ার লোকেরা জানলে, পাড়া-ছাড়া করে দেবে কি? আমার পরিবারের বাকিদের কী কী হেনস্থা হবে? আমি হাসপাতালে থাকলে কেউ দেখা করতে পারবে তো? আমি মারা গেলে মৃতদেহ পরিবারকে না দেখিয়ে ধাপার মাঠে পুড়িয়ে দেওয়া হবে?

—এই যদি অসুখটা নিয়ে আমার জানা হয়, যা আমার কাছে 'জানা' হিসেবে আসছে প্রতিদিন, তাহলে আমার মনের অসুখ হওয়াটা কি অস্বাভাবিক? তুমিই বলো!

আর, যতক্ষণ না এই সব প্রশ্নের উত্তর, সমস্যার সমাধান, যেখান থেকে এলে আমি ভরসা পেতে পারি, ততদিন তো আমার মনের অসুখ থাকবেই, তাই নয় কি?

আমি অর্থনৈতিক দুশ্চিন্তার কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, সেই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যাবে না তা জানি, এটা কি মনের চিকিৎসকদের পক্ষে সামলানো সম্ভব? নাকি এটা সরকার, সমাজ, সংগঠন, ব্যক্তি...সবার কাজ? তোমার কাছে জানতে চাইছি!

▪ **মোহিত** : এই মহামারী কিংবা অতিমারী-র সময়ে, আপনি যাদের কথা বললেন, তাদের প্রত্যেকেরই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ব্যক্তি থেকে সরকার...প্রত্যেকেরই কিছু

দায়িত্ব রয়েছে। প্রেসক্রিপশন-ধর্মী কোনো কথা বলার ধৃষ্টতা আমার নেই। প্রত্যেকের প্রতি সম্মান রেখেই আমার মনে যে ভাবনাগুলো আসছে, সেগুলো বলার চেষ্টা করবো।

একজন ব্যক্তি হিসাবে যেমন আমার অমূলক আতঙ্কিত না-হয়ে সচেতন সতর্কতা নেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে, পাশের মানুষকে সতর্কতা সম্পর্কে সচেতন করে তোলার দায়িত্বও রয়েছে। নিজের মধ্যে 'কোভিড'-এর লক্ষণ চোখে পড়লে অবহেলা না-করে দ্রুত চিকিৎসকের মতামত নেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে, এর পাশাপাশি বাড়িতে কিংবা বাড়ির বাইরে অন্যরা যাতে আমার দ্বারা সংক্রমিত না হন, তার জন্য সজাগ থাকার দায়িত্ব রয়েছে। অন্য কেউ সংক্রমিত হলে, মানবিক এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার জায়গা থেকে, ব্যক্তিগত সুরক্ষা সতর্কতা নিয়েই, যথাসাধ্য সহযোগিতার হাত সেই বিপন্ন মানুষ এবং তাঁর পরিবারের দিকে বাড়িয়ে দেওয়ার দায়িত্ব রয়েছে। ব্যক্তি মানুষ হিসাবে এই কাজগুলোও যদি আমরা করতে পারি, তাহলেও আমাদের চারপাশটা সুন্দর হয়ে ওঠে।

ব্যক্তি মানুষের সমন্বয়েই গড়ে ওঠে পরিবার। পরিবারে থাকা অন্যদের ভূমিকা হোক পরিবারের আক্রান্ত মানুষটিকে সংক্রমণের জন্য অকারণ দোষারোপ না-করে, অমূলক উদ্বেগ উৎকণ্ঠা, ভয়, আতঙ্ক কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করা, তাঁর বিপন্নতার অনুভূতি তাঁর জায়গা থেকে, তাঁর পরিস্থিতি থেকে বুঝতে চেষ্টা করা, তাঁর 'টেস্ট' করানোর উদ্যোগ নেওয়া, চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, চিকিৎসা এবং আইসোলেশন-পর্বে তাঁর যত্ন-পরিচর্যার উদ্যোগ নেওয়া। এই অসুস্থতার সময়ে পরিবারের সকলে তাঁর সঙ্গে আছে এবং থাকবে, এই আন্তরিক অঙ্গীকার উচ্চারিত হোক্। পরিবারের একজন হিসাবে এটুকুও যদি আমরা না করতে পারি, তাহলে আর পরিবার কীসের?

বন্ধু বান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশী হিসাবে, পাড়ার ক্লাব, সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন হিসাবেও আমাদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব থেকে যায় যে কোনো বিপর্যয়ের সময়ে। আমরা এই কোভিড সংক্রমণের সময়ে সমাজের এই অংশের ভূমিকা অনেক জায়গায় যা দেখেছি আমরা তাতে ক্ষুব্ধ হয়েছি, লজ্জা পেয়েছি। বিপন্ন প্রতিবেশীকে এমনভাবে অস্পৃশ্য করে দেওয়া যায়, সমাজের শত্রু হিসাবে দেগে দেওয়া যায়, এ এতো ব্যাপক মাত্রায় আগে আমরা দেখিনি।

কিন্তু, এই ছবিটাই একমাত্র ছবি নয়। আমরা এই সময়ে বহু ব্যক্তি মানুষ, বহু ছোটো-বড় সংগঠনকে দেখলাম জীবনের ঝুঁকি নিয়েও ঝাঁপিয়ে পড়তে। যে প্রশ্নগুলো, শুভেন্দু দা, আপনার মনে দেখা দিয়েছে অনিশ্চয়তা আর আশঙ্কার চেহারা নিয়ে, সেই প্রশ্নগুলোরই উত্তর নিয়ে আমরা সমাজের অংশ হিসাবে পৌঁছে যেতে পারি

বিপন্ন মানুষের কাছে। তাঁকে বলতে পারি, আমরা আপনার সঙ্গে আছি, যে কোনও প্রয়োজনে আমাদের পাশে পাবেন। এই রইল আমাদের সঙ্গে যোগাযোগের নম্বর। এতেই অনেকখানি ভরসা তৈরি হয় মনের মধ্যে।

সামাজিক সংগঠন হিসাবে আমরা যেগুলো করতে পারি :

কোভিডে আক্রান্ত মানুষের পাশে দাঁড়াতে পাড়ার কিংবা এলাকার ডাক্তারবাবুদের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের কাছে সাহায্যের আবেদন করতে পারি, কোভিড আক্রান্ত মানুষের জন্য চিকিৎসা সহায়তার প্রতিশ্রুতি চেয়ে নিতে পারি, সরকারী-বেসরকারী অ্যাম্বুলেন্সের ফোন নম্বর রাখতে পারি— যাতে প্রয়োজনে যোগাযোগ করা যায়, কোভিড হাসপাতাল, সেফ হোমের তালিকা-ফোন নম্বর জোগাড় করে রাখতে পারি, রক্তে অক্সিজেন স্যাচুরেশন মাত্রা পরীক্ষার জন্য কয়েকটি অক্সিমিটার জোগাড় করে রাখতে পারি— যাতে রোগ লক্ষণ থাকা একজন মানুষের বাড়িতে গিয়ে নিয়মিত পরীক্ষা করা যায়, আর অবশ্যই প্রশাসনের দায়িত্বে থাকা লোকজনের ফোন নম্বর- বিশেষত কোভিড ১৯ পরিষেবার দায়িত্বে থাকা স্থানীয় কর্পোরেশন/পুরসভা/ পঞ্চায়েত প্রশাসনের নোডাল অফিসারের ফোন নম্বর জোগাড় করে রাখতে পারি— যাতে যে কোনো বিশেষ পরিস্থিতিতে তাঁদের সাহায্য পাওয়া যায়।

আমরা যখন অনেকেই আত্মকেন্দ্রিকতার ঘেরাটোপে নিজের অজান্তেই বন্দি হয়ে পড়েছি, ঠিক এমন এক সময়ে 'কোভিড ১৯'-এর সংক্রমণ আমাদের বুঝিয়ে দিয়ে গেল, পৃথিবীতে কোনো বিপর্যয় একক মানুষ সামাল দিতে পারে না! তা সে সুপার সাইক্লোন হোক বা বন্যা হোক কিংবা মহামারী! বহু মানুষের সংঘবদ্ধ উদ্যোগ ছাড়া কোনো বিপর্যয় আমরা সামাল দিতে পারি না! এই কোভিড ১৯ আমাদের সুযোগ করে দিল, একেবারে বাড়ির কাছে, বিপদগ্রস্ত মানুষের কাছে যাবার, বিপন্ন মানুষের হাত ধরার। এই সুযোগ এমনভাবে হয়তো আগে কখনো আসেনি।

চিকিৎসক সমাজের একটা বড় অংশকে যেমন আমরা দেখেছি কোভিড সংক্রমণের সময়ে সামনে থেকে যুঝতে, কাশ্মীরী সেই চিকিৎসকের কথা কখনো ভুলবো না, যিনি পিপিই খুলে কোভিড আক্রান্ত শ্বাসকষ্ট হওয়া রোগীকে মুখে মুখ দিয়ে শ্বাসপ্রশ্বাস সচল রাখতে চেষ্টা করেছিলেন। ভুলবো না কোভিড হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত সরকারী ও বেসরকারী বহু চিকিৎসক— যাঁরা সামনে থেকে কোভিড মোকাবিলা করেছেন, শহর-মফস্বল-গ্রামের অসংখ্য ডিগ্রিধারী চিকিৎসক এবং সংখ্যায় আরও অনেক ডিগ্রিহীন 'গ্রামীণ চিকিৎসক' সামনে থেকে বিপন্ন মানুষকে চিকিৎসা পরিষেবা দিয়েছেন। সেই চিকিৎসকদের অনেকে নিজেরাই আক্রান্ত হয়েছেন কোভিড১৯-এর সংক্রমণে, প্রাণ হারিয়েছেন অনেক চিকিৎসক। আবার চিকিৎসকদের বৃহত্তম অংশকে

আমরা দেখলাম দুয়ার এঁটে ঘরে বসে থাকতে। যাঁরা দুয়ার এঁটে ঘরে থাকলেন, তাঁদের যুক্তির কোনো অভাব নেই! বুদ্ধিমান মানুষদের যুক্তির অভাব হয় না। শুধু আমরা সাধারণ মানুষ বড়ো অসহায় বোধ করেছি যখন দেখেছি 'হিপোক্রেটিক শপথ' নেওয়া ডাক্তারবাবুরা জ্বর হওয়া রোগীকে দেখতে অস্বীকার করেছেন। অসহায় বোধ করেছি কর্পোরেট হাসপাতালের ডাক্তারবাবুরা মানুষের ভয় কমানোর বদলে টেলিভিশন চ্যানেলে বসে 'বিজ্ঞানের নামাবলী' গায়ে দিয়ে মানুষের আতঙ্ক বাড়িয়েছেন, সঙ্গে বাড়িয়েছেন কর্পোরেট হাসপাতালের লাগামহীন ব্যবসা, টেলিভিশন চ্যানেলের টিআরপি। মিডিয়াও জানে ভয় আর আতঙ্কেরও ভালো বাজার রয়েছে, যেমন আমরা ভূতের সিনেমা দেখতে ভালোবাসি। চিকিৎসক আর সংবাদমাধ্যমের নৈতিকতার দিকগুলো নিয়ে চর্চা শুরু হোক্ নতুন করে। আত্মসমালোচনা শুরু হোক্ চিকিৎসক মহল থেকেই!

কোভিড সংক্রমণের শুরুতে আমাদের দেশে আমরা দেখলাম বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা কোভিড ১৯ সংক্রমণকে বিশ্বজুড়ে প্যান্ডেমিক বা অতিমারী ঘোষণার তিনদিন পরেও গত ১১ মার্চ কেন্দ্রীয় সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের মুখপাত্র বলেছেন, আমাদের দেশে এখনও কোভিড কোনো জরুরি পরিস্থিতি নয়। তাঁর এই মন্তব্যেই সরকারের দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় লেখা থাকবে। বিপর্যয় মোকাবিলায় যে প্রস্তুতি প্রয়োজন, তার ছিটেফোঁটাও ছিল না সরকারের তরফ থেকে। লোকসভায় কেন্দ্রীয় সরকারের সড়ক, পরিবহন ও হাইওয়ে মন্ত্রী ভি কে সিং জানিয়েছেন, মার্চ থেকে জুনের 'লক ডাউন' পর্বে এক কোটিরও বেশি প্রবাসী শ্রমিক হেঁটে বাড়ি ফিরেছেন। স্বাস্থ্য এবং জনস্বাস্থ্যে এতদিনের চূড়ান্ত অবহেলা ঢাকতে তাদের একমাত্র পথ ছিল 'সর্বাত্মক লক ডাউন'। হঠাৎ জারি করা, দায়িত্বজ্ঞানহীন এই 'লক ডাউন' আপামর দেশবাসীকে চূড়ান্ত বিপর্যয়ের মুখে দাঁড় করিয়েছে। বিশেষ করে 'দিন আনা-দিন খাওয়া' মানুষদের, প্রবাসী শ্রমিকদের, বেসরকারী ক্ষেত্রের কর্মীদের, ক্রনিক শারীরিক ও মানসিক অসুখে আক্রান্ত মানুষদের, চাকুরি-প্রার্থীদের, পড়ুয়াদের এবং আরও বহু মানুষকে। সংশোধনাগার বা জেলখানার বন্দীরাও অনেকে আক্রান্ত হলেন 'কোভিড ১৯'-এ। ভারতের বহু জেলখানার এমন ঘটনা ঘটলো। তবু তাঁদের এই অতিমারীর সময়েও সরকার জামিন দেওয়ার কথা ভাবলো না। অশীতিপর বিপ্লবী কবি ভারভারা রাওয়ের জামিনের আবেদন নাকচ করা হয়। সরকারি উকিল বলেছিলেন, 'তিনি বয়স আর অসুস্থতার সুযোগ নিতে চাইছেন।' মানবিক সমস্ত বোধ না-হারালে এমন কথা কেউ বলতে পারে না।

আমাদের এই রাজ্যেও দমদম জেলে আতঙ্কিত বন্দীদের ওপর গুলি চলছে। বেশ কয়েকজন বন্দী মারা গেছেন, আহত হয়েছেন অনেকেই।

'সর্বাত্মক লক ডাউন'-এর সময়ে আমরা এই রাজ্যে দেখলাম মানুষ সরকারী গণবন্টন ব্যবস্থায় ঝাঁপ পড়ে গেল— খাদ্য সরবরাহের দায়িত্ব বর্তাল পুলিশের ওপর, কোভিড-আক্রান্ত মানুষকে হাসপাতালে ভর্তির জন্য নিয়ে যেতে স্বাস্থ্যকর্মীদের দায়িত্ব দেওয়া হলো না— এলো পুলিশ, পঞ্চায়েত/পুরসভা/কর্পোরেশন... কার্যত উধাও হয়ে গেল! সব দায়িত্ব এসে পড়লো পুলিশের ওপর! পুরো প্রশাসনিক ব্যবস্থাই হয়ে পড়ল পুলিশ-নির্ভর। এই পরিস্থিতি আসলে শাসকের হীনম্মন্যতাকেই তুলে ধরেছে। প্রশাসনের সার্বিক পুলিশ-নির্ভরতার মূলে থাকে নিজের ওপর প্রবল অনাস্থাই।

এই অভিজ্ঞতাগুলো থেকে শিক্ষা নিক প্রশাসন-সরকার। স্বাস্থ্য নিয়ে-জনস্বাস্থ্য নিয়ে, দেশের মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিয়ে, সকলের জন্য গুণগত মানের শিক্ষা নিয়ে গুরুত্ব দিয়ে ভাবনা শুরু করুক সরকার। কর্পোরেটের স্বার্থে 'উন্নয়ন'-এর নামে বন-জঙ্গল-পাহাড়-নদী-জলাশয় ধ্বংস করে প্রকৃতিতে থাকা হাজারো ব্যাকটেরিয়া আর ভাইরাস যারা আশ্রয়চ্যুত হচ্ছে— তারা আশ্রয় হিসাবে বেছে নেবে হয়তো শেষ অব্দি মানুষের শরীরই! তাই পরিবেশ রক্ষার দায়িত্বও যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা হয়তো আমরা আগামী কোনো বিপর্যয়ের অভিজ্ঞতা দিয়ে শিখবো! দেশের সার্বিক মানবোন্নয়ন না-হলে যে কেউ ছাড় পাবে না— তা দেখিয়ে দিয়েছে করোনা ভাইরাস। সর্বোচ্চ নিরাপত্তার বলয়ও যে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেয়া যায়, তা প্রমাণ করেছে এই ভাইরাস।

সারা দেশের গরীব মানুষ যখন নিদারুণ অর্থ সঙ্কট আর বিপর্যয়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, ঠিক এই সময়েই, এই কোভিড সংক্রমণের সময়েই কেন্দ্রীয় সরকার একের পর এক জনবিরোধী বিল শুধুমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে পাশ করিয়ে নিচ্ছে লোকসভায়। সারা দেশের কৃষকদের প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও কৃষকের নিরাপত্তা কেড়ে নিয়ে কর্পোরেটের স্বার্থে আনা হলো কৃষি বিল। মজুতদারদের সুবিধা করে দিতে আনা হলো, অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আইন সংশোধনী বিল। চাল, ডাল, আলু, ভোজ্য তেল এই নতুন আইনের ফলে অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হলো। শ্রম বিল এনে কেড়ে নেওয়া হলো শ্রমিকের কাজের নিরাপত্তা। যে কোনো সময় মালিক চাইলেই ছাঁটাই করতে পারে শ্রমিককে। শ্রমিকদের ধর্মঘটের অধিকারের ওপর নেমে এলো খাঁড়া। একের পর এক এত দিনের চেষ্টায় অর্জিত সব অধিকার কর্পোরেটের স্বার্থে কেড়ে নেওয়াই যে সরকারের একমাত্র লক্ষ্য, তাদের কাছে সত্যিই কতটুকু প্রত্যাশা করতে পারি আমরা! এই সত্য যদি আমরা ভেবে না দেখি, তাহলে আগামী দিনে আরও বড় বিপর্যয় অনিবার্য।